কারুবাসনা

আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড্ড ক্ষতি হয়। কয়েকদিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরনো। ছেঁড়া-খোড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখে মুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে। গত বছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশান করি, ট্রাম-সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম; ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিন খানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনি নি; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়; ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেক দিন ধরে দেখি নি; বই ক-খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি। টিনের সুটকেসে করে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম; খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম; বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি; শালিক ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে, দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।

আমাদের এ-ঘরে উঁইয়ের অত্যাচার বড় বেশি; মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাত-সেঁতে; বর্ষাকালে উঁইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়—খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়ে ঘরে তিনি উঁই ছড়িয়ে দিয়ে তামাসা দেখেন। নানা রকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের, ছিবড়ে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।

দু-তিন দিন আগে শেল্‌ফের বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখেছি একবার। আজ আরেকবার দেখা যাক, কিন্তু যাই-যাই করে আর যাওয়া হয় না; জানালার ভিতর দিয়ে বর্ষার দিকে তাকিয়ে মন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দুপুরবেলা দেখলাম বইয়ের তাক ঠিকই আছে, উঁইয়ে ধরে নি, নতুন বইয়ের লাল-নীল মলাটগুলো কেমন ছাতকুড়োয় সাদা-সাদা হয়ে গেছে।

কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।'

কল্যাণী সেলাই করছিল; কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে-মুছতে—'মাঝে-মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে-থাকতে তিন মাস হয়ে গেল। প্রায় এক মাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।

সে একটা অস্টিন মোটরকার চায় না বটে, সুসজ্জিত বাংলোও চায় না, আমাকে যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, তিন বছর আগে, মানুষের জীবনের নিদারুণ পরিমাপের টের যখন সে পায় নি, তখন কী চাইত জানি না, কিন্তু আজ একজন সামান্য স্কুলমাস্টারের গৃহস্থালীর ব্যবস্থাও নিজের হাতে যদি সে পায়, জীবনকে ধন্য মনে করে। কিন্তু এমনই ব্যবস্থা, একটা স্কুলমাস্টারি জোটে না। 'আচ্ছা, আমি যদি ট্রাম কন্ডাকটার হই? কী বল কল্যাণী?'

'টি-সি হবার জন্যই এম-এ পাস করেছিলে?'

'কিন্তু সেও তো কাজ—মাসে-মাসে ২৫,২০ কি দেবে না?'

'বেশ তো, তা হলে তাই করো গিয়ে।'

'এবার কলকাতায় গিয়ে যা হয় একটা কিছু করবই।'

কল্যাণী চুপ করে রইল।

'কী করব জানো?'

কোনো সাড়া নেই।

হেমন্তের বিকেলের নিস্তব্ধ ম্লানতার ভিতর একটা রুগ্ন হাঁসের মত শুকনো পাতার উড়াউড়ির মধ্যে হংসগামিনী গতিতে একা-একা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। গলা খাঁকরে-'কী করব, জানো কল্যাণী?'

কল্যাণী আঁতকে উঠে-'বাপরে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এ-রকম! বেটপকা চেঁচিয়ে ওঠো কেন?'

'না, চেঁচাইনি তো'—

'না, না, এ-রকম আচমকা ভয় পাইয়ে দিও না, ইস, কী রকম ধড়ফড় করছে বুক।'

'এখনো? কী হল?'

'কিছু না, বাপরে, কী রকম চমকে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে?'

কল্যাণী—'কথা বলো না, আমাকে একটু চুপ থাকতে দাও; কথা বলতে গেলে হার্টে কষ্ট হয়।'

'বুকে হাত বুলিয়ে দেব?'

'থাক্'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাছে আসি?'

'না'

'কেন?'

'কেন?'

'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

পাখা নিয়ে এগিয়ে গেলাম—বাতাস দিতেই কল্যাণী—'পাখা রেখে দাও, ঠাণ্ডা লাগে।'

রেখে দিলাম।

'গরম দুধ খাবে?'

'না, দরকার নেই।'

বালিশে খানিকক্ষণ মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কল্যাণী—'বাঃ, তুমি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'দেখছিলাম'

'না, মরতে এখনো দেরি আছে ঢের।'

'মরার কথা নয়।'

হ্যাঁ, যা বলছিলে, আমাকে একটু গরম দুধ এনে দাও ত।'

'আচ্ছা দিচ্ছি।'

'কিন্তু এখন দুপুরবেলা সব্বায়ের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে; কোত্থেকে এনে দেবে?'

'কেন খুকির দুধই তো আছে।'

'তা হলে খুকি কী খাবে?'

মাথা হেঁট করে একটু ভেবে, 'বেশ, পিসিমার দুধের থেকে এনে দেব তা হলে।'

'কী করে আনবে?'

'চুপ করে ছিলাম।

'পিসিমার কাছে গিয়ে চাইবে?'

ঈষৎ হাসতে চেষ্টা করে—'হ্যাঁ, দরকার হয়েছে, চেয়ে আনব।'

'কেন, আমি কি ভিখিরির মেয়ে যে পরের কাছ থেকে দুধ ভিখ করে ছাড়া খেতে পারব না।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এক গ্লাস দুধ, তা পিসিমা খুশি হয়েই দেবেন।'

কল্যাণী একটা নিশ্বাস ফেলে, 'যাক্ যা কাজ করছিলে তাই করো গিয়ে, দুধ আমার লাগবে না।'

বই মুছতে লাগলাম।

কল্যাণী উঠে বসে, সুচ—সুতো হাতে নিয়ে—'তোমাকে বিশ্বাস নেই।'

'কেন?'

'আধঘন্টা পর হয় ত পিসিমার কাছ থেকে দুধ চেয়ে এনে বলবে, বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম।'

একটু থেমে, 'না তা আর বলব না।'

'বিনয় ভট্টাচার্যের চায়ের দোকানে খুব ভাল দুধ পাওয়া যায়?'

মাথা নেড়ে, 'তা পাওয়া যায়।'

'কত করে নেয় এক গ্লাস?'

'দু আনা'

'ওঃ, দু আনা বুঝি?'

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই করছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উল্টাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সার সম্বল আজ আমার কাছে নেই। এবং আমার বয়স চৌত্রিশ, বার বছর আগে এম-এ পাস করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এম-এ ডিগ্রী ও স্ত্রী সন্তান-সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না আক্ষেপের কথা হয় ত। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আর? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয়।

বিকেলের ধূসরতার ভিতর যখন সবুজ ঘাসের মাঠের পথে হাঁটতে থাকি, কিংবা হেমন্তের সন্ধ্যায় চড়ুই-শালিক যখন উড়ে চলে গেছে, দিকে-দিকে কুয়াশা জমে ওঠে, লক্ষ্মীপূজোর ধূপের ভিতরেও যখন গন্ধ, কিংবা আরো গভীর রাতে অশ্বত্থের ডালপালা যখন জ্যোৎস্নার বাতাসে ঝিরঝির করে, কত বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার নীড় বুকে নিয়ে বিরাট বটগাছ দাঁড়িয়ে থাকে, বটের নিচে উপকথার পথিক গিয়ে দাঁড়ায়—এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনের এই আর-এক রূপ। এই রূপের পথে চলতে-চলতে কিশোর বেলার নষ্ট প্রেমের বেদনা ও লাঞ্ছনা ভুলতে চেয়েছিলাম, আজকের সংসারের ক্ষয় ও ক্ষতি নিয়ে আক্ষেপ করব?

অবিশ্যি বাবার কাছে চাইলে দু আনা পয়সা পাওয়া যায়। দু আনা চাইলে তিনি হয় ত চার আনাও দিয়ে দেবেন। আমি মুখ ফুটে বড় একটা চাই না কি-না। সেই জন্য, চাইলেই, তিনি যতদূর সম্ভব দিয়ে দেন। অবিলম্বে অকাতরে আমার কলকাতার খাওয়ার খরচও তিনিই যোগাড় করে দেবেন; তারপর দাদাকে বেরিলিতে লিখে দেবেন আমার কলকাতার মেসের খরচটা কিছুদিন চালাতে—যে পর্যন্ত না আমি ট্যুইশান পাই।

আমি ট্যুইশান পাই বা না পাই, আমি কলকাতায় এলেই দাদা একটা মাস মেসের খচর দেন; তার পর বন্ধ করে দেন—শত অনুনয়-অনুরোধ করলেও কিছুই গ্রাহ্য করেন না, আমার টিকিটের পয়সা খরচ হয় শুধু; কাজেই অনুরোধ করে চিঠি লিখতে যাই না, এক মাসের টাকা দিয়ে তিন মাস চালাতে চেষ্টা করি—দেশের বাড়িতে খরচ যেন তিনি বন্ধ না করেন, ভবিতব্যের কাছে এই প্রার্থনা করি।

বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বন্ধ করবেন না, কিন্তু বাবা চলে গেলে পর? জীবন যদি তখনো আমার এই পথে চলে? কিন্তু কেনই-বা চলবে? ভবিষ্যতের জন্য আশা করা যাক। না হয়, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ের ব্যবস্থা করব, যে-টুকু জমি আছে তাতে লাউ-কুমড়ো-বেগুন-মরিচের গাছ লাগিয়ে দেব; আর চাল? ভাবছিলাম।

কল্যাণী—'খুব বেশি নেয় তো তা হলে?'

'কে বেশি নেয়, কল্যাণী?'

'এক গ্লাস দুধ দু আনা নেয় বললে—'

'হ্যাঁ'

'বেশ টাটকা দুধ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, খুব'

'তুমি খেয়ে দেখেছ?'

'না খাইনি'

'বিনয় ভট্টাচার্যের দোকানে শিগগির যাও নি বুঝি?'

'না'

'এক কাপ চা খেতেও যাও নি?'

'না, শিগগির গিয়েছি মনে পড়ে না।'

'সত্যি যাও নি? বারে, এত তো চায়ের ভক্ত ছিলে। কি, বাড়িতে তো চা পাও না, আমি তো ভাবতাম বিনয় ভট্টাচার্যের দোকান থেকে চা খেয়ে আস তুমি।'

'না, মাঝে-মাঝে একটা চুরুট কিনতে যাই'

'চুরুট?'

'হ্যাঁ'

'আর-কিছু না?'

মাথা নাড়লাম—'না'

'চুরুট তো তোমাকে খেতে দেখি না আমি'

'মাসের মধ্যে দু-একটা খাই'

'তাই-বা কখন খাও?'

'খাই রাস্তায়—সন্ধ্যার সময়'

'বেশ লাগে?'

'মন্দ কী!'

'কিন্তু দুধ খেও'

'কে? আমি?'

'হ্যাঁ'

'কেন বলো ত?'

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।

একটু চুপ করে বললে, 'আধ গ্লাস দুধ চার পয়সায় দেবে?'

'তা দিতে পারে, দর কষাকষি করতে হবে।' আরো খানিকক্ষণ ভেবে কল্যাণী, 'তা হলে নিয়েসো তো'। অত্যন্ত জড়সড়ভাবে, যথেষ্ট সময় খচর করে, আঁচলের গাঁটের থেকে একটা এক আনি বের করলে, দেখলাম, খানিকটা তেলা—

আরো কিছু খুচরো পয়সা বেচারির গাঁটে ছিল, কিন্তু এক আনিটা বদল করবার ভরসা পেলাম না। না হয় চার পয়সার বাকি দুধ বিনয়ের কাছ থেকে আনা যাবে।

তাই আনলাম।

কিন্তু দুধ নিয়ে হাজির হয়ে দেখি, আর-এক সমস্যা; সে কিছুতেই খাবে না, খেতে হবে আমাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললে, 'তুমি কী বেকুব! তোমাকে দুধ খাবার জন্য চারটে পয়সা দিলাম আমি, হাত-পা রোগা বকের মত হয়ে যাচ্ছে, কোথায় দোকানে বসে খেয়ে আসবে, না, সেই দুধ তুমি এতটা পথ বয়ে আনলে আমার জন্য!'

বিক্ষুব্ধ ঝাঁঝে আমার দিকে আপাদমস্তক তাকাতে লাগল সে।

'কই, তুমি ত একবারও বলো নি কল্যাণী?'

'কী বলি নি।'

'যখন পয়সা দিলে বল্লো নি তো যে—'

কিন্তু খোঁচা দিয়ে ভুল দেখিয়ে এই নারীটিকে পরাস্ত করে কী লাভ?

বাদলের দুপুরে এক-একটা নিরাশ্রয় দাঁড়কাক আমাদের উঠোনের পেয়ারার ডালে বসে ভিজতে থাকে, তাকে দান করতে হয়, কেউ কোনোদিন তার কাছ থেকে গ্রহণ করবার কথা ভাবতে পারে কি?

'আমি এক কাপ চা খেয়ে এসেছি; আর একটা চুরুট।'

'কে? তুমি? দুধ খেলে না কেন? দুধের জন্যই তো পয়সা দেওয়া। তোমার শরীরের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হয়। বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে এলে, সব করলে, তবুও আমার কথাটা শুনলে না।'

'দুধ তোমার জুড়িয়ে যাচ্ছে, বক-বক বক-বক বক-বক কথাবার্তা পরে হবে। আগে খেয়ে নাও।'

গ্লাসটা তার হাতে দিলাম।

'বাঃ, এই গ্লাসটা কার?'

'বিনয়ের'

'বেশ সুন্দর কাচের গ্লাস তো'

আমরা চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি খাও।'

চুপ করে বই পড়ছিলাম।

কল্যাণী, 'তুমি নাকি আবার চা খেয়ে এসেছ, চুরুটও?'

গেলাসটা সে ঠোঁট অব্দি তুললে, 'কই কথার উত্তর দাও না যে?'

'কোন কথা?'

'চা-চুরুট খেয়ে পেট ভরিয়ে আস নি?'

'হ্যাঃ'

'তা যদি না-ভরতে তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে দুধ খেতে হত।'

'তা, তোমার পাল্লায় পড়লে।'

'আমি কি আমার জন্য আনিয়েছি, এটা তুমি বুঝলে না?'

তাকিয়ে দেখি দুধ তখনো অভুক্ত।

কাজেই, ব্লামেশ্বরের ছেঁড়া ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—আমি চলে না গেলে এ বেচারির দুধ আর খাওয়া হবে না।

কল্যাণী—'কোথায় যাচ্ছ?'

'রমনীবাবুর বাড়ি'

'কেন?'

'একটা বই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মিনিট পনের পরে ফিরে এসে দেখি গ্লাস যেমনি, তেমনি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'এখনো খাও নি?'

'নাঃ'

'কেন?'

'ভক্তি হচ্ছে না খেতে'

'কিসের জন্য কল্যাণী? দোকানের দুধ বলে? দাও আমি খেয়ে ফেলি'

হাত বাড়াতেই দুধের গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে কল্যাণী, মিনমিন করে হেসে 'ইস্, দোকানের জিনিস আমি খাই না বুঝি?'

আমার দিকে তাকিয়ে কল্যাণী একটু লজ্জিত হয়ে—'ছি, খেতে চেয়েছিলে—

বাধা দিলাম, এই নাও—'

ফিরে চেয়ে দেখলাম সে দুধের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে আমার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, হাতভরা তার অনিচ্ছা ও অনগ্রসরের অসাড়তা; মুখখানা হেমন্তের সন্ধ্যার মত হিম, বেদনাতুর; মৃত সন্তানের মুখের উপর নিবদ্ধ মৃতবৎসা হরিণীর মত বিহ্বল বিষণ্ণ চোখ।

উটের লোম দিয়ে যে—ব্রাশ তৈরি হয়, যার সঙ্গে রং মাখিয়ে মানুষ ছবি আঁকে, সেই ব্রাশই-বা কোথায়? রং-ই বা কোথায়? ছবি আঁকবার শক্তিই বা কোথায়? [রিং-তুলি] নিয়ে একবার যে ছবি এঁকে ছিল আজ এই কল্যাণীর ছবি এঁকে যাক্—

'না, খাও'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে? আমি খাব?'

আমার স্বরের ভিতর তৃষ্ণা ও আগ্রহের পরিচয় পেয়ে গ্লাসটা সে নিজের দিকে সরিয়ে নিল—

'দুধ কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কল্যাণী'

'বেশ, গরম করে নিয়ে এলেই হবে?'

'কে গরম করবে?'

'আমিই করে আনব'

'তারপর খাবে কে?'

'কেন? তুমি খেতে চাও নাকি?'

একটা বই তুলে নিয়ে, একটু দূরে সরে যেতেই কল্যাণী গ্লাসটা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল।

'খাবে, খাও'

'দাও'

'আচ্ছা, একটু গরম করে নিয়ে আসি'

'আনো'

'তা, এই বেশ গরম আছে'

'তবে এই-ই দাও'

'একটু চিনি মিশিয়ে দেব?'

'তা দিতে পারো'

'চিনি হয় ত ওরা দিয়ে দিয়েছে'

'তা দিয়ে থাকবে'

'খাবে?'

'দিলেই খাই'

'কেন? তুমি কি মনে কর একটু দুধের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বঞ্চনা করব?'

'না, সে কথা কে ভাবে কল্যাণী।

'তুমি কী পড়ছ?'

'একটা বই'

'দুধটা মিষ্টি'

'ও, খাচ্ছ বুঝি?'

তাকিয়ে দেখলাম সে লজ্জিত হয়ে আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম—'কী হল?'

'ভুলে চুমুক দিয়ে ফেললাম যে'

'বেশ করেছ।'

'এখন কী হবে?'

'কেন?'

'তুমি যে আর খেতে পারবে না।'

'তা, আমার খেতে আপত্তি নেই।'

'ছি, আমার মুখেরটা খাবে?'

'তা আমি খেতে পারি'

'কিন্তু আমি কিছুতেই সে অনাচার হতে দিতে পারি না ত।'

আধ ঘণ্টা পরে তাকিয়ে দেখলাম দুধের শূন্য গ্লাসটা পড়ে আছে, কল্যাণী নেই, ঘুমুচ্ছে হয় ত।

গেলাসটা ধুয়ে নিয়ে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিনয়ের দোকানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম। এই কল্যাণী আমার স্ত্রী, তিন বছর আমি বিয়ে করেছি তাকে, কিন্তু এ তিন বছরের ভিতর প্রেমিকের পুলক একদিনও বোধ করেছি? নির্বিকার নিঃসঙ্কোচে আত্মদান অনুভব করেছে কল্যাণী? ইস্, গ্লাসটা হাতের থেকে পড়ে ভেঙে গেল। কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে-কুড়োতে কল্যাণীর কথাই ভাবছিলাম আবার।

আমাদের রক্তমাংসের সার্থকতার খাবার সময়, দাঁড়াবার সময়, হাঁটবার চলবার সময়। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সার্থকতা মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার কিংবা সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশ প্রান্তরের নিরবয়ব, অবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?

জানি না।

এই চৌত্রিশ বছরে অনেক চিঠি জমিয়েছি; একটা মস্ত বড় টিনের বাক্সে চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম। চিরদিনই মনে করে এসেছি যে ভবিষ্যতে কোনো এক দিন এই চিঠিগুলো একে-একে পড়ব।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে বাবলাগাছের ঘন নিবিড় বেড়া দিয়ে মাঠটাকে রাখব ঘিরে। কিংবা বুনো কাঠ দিয়ে; ছোট-খাট নানা ঝুমকো লতা, কুঞ্জ লতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো-বাতাস কাক-শালিক ও পাখ-পাখালির সাড়া-শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিস, পাশে হয় ত মেঘনা, ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী; মাঠের ভিতর ইতস্তত অশথ গাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠাল, বেতের বন, কাশ, কালসোনা ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি, চোত-বোশেখের দুপুর, শরতের রাত, হেমন্তের বিকাল, অপার্থিব বট।

এমনি আবহাওয়ার ভিতর ঘরের বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে বসে কিংবা অন্ধকার রাতে আলোর পাশে একটা মাদুর বিছিয়ে নিয়ে একে-একে চিঠিগুলো পড়ব; এই রকম ভেবেছিলাম আমি। নির্মলার চিঠি আছে, মার অনেকগুলো চিঠি, দাদার চিঠি, তা ছাড়া আরো নানা রকম ঘটনাস্রোতের বুক থেকে জড়ো করা ঢের। দু-পাঁচজন নারীর উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও রুচিৎ বিহ্বলতার চিঠি আছে। দু-তিনটি দেশপ্রেমিকের চিঠি আছে, লিখে সাহিত্যে নাম করেছে যারা কিংবা আজও সন্ত্রাস করে চলেছে, তারাও আমাকে তাদের মধ্যে একজন ভেবে চিঠি লিখত। সবই সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি—জীবনের ভাঁটার সময় একদিন ম্লান আলোর পাশে এগুলো পড়ব বলে।

তাও বিশ বছর ধরে এগুলো জমিয়েছি; পোকা, ইঁদুর ও উঁইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছি।

মা অনেকবার বলেছেন এই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতে, এই চিঠি বোঝাই বাক্সটা কল্যাণীর চক্ষুশূল; আমি নিজেও, মাঝে-মাঝে ভেবেছি, মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে তার হৃদয়। সঞ্চয় যদি কিছু করতে হয় তবে সেখানে করা ভাল। টিনের বাক্সের ভিতর কেন? কিন্তু তবুও টিনের বাক্সটা অনেক ঝড় কাটিয়ে টিকে রয়েছে আজও। বাক্সের ভিতর আমার নিজের লেখা কয়েকখানা খাতাও ছিল।

বিনয়কে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে এসে বাক্সটা খুললাম।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতরেই মনে হল, কেরোসিন তেল ও দেশলাই ছাড়া আর-উপায় নেই।

আচ্ছা মাধুরীর কি একখানা চিঠিও আস্ত আছে? বিহ্বলভাবে অজস্র চিঠির ছিবড়ের ভিতর খুঁজছিলাম, মাধুরীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি, মাধুরীর চিঠি। আঙুলে উঁইয়ের কামড় লাগছে—কাদা মাটি ও গলিত উঁইয়ের রসে হাত যাচ্ছে ভরে, কিন্তু সেই চৌদ্দ পাতা, আঠার পাতা—এক-একখানা চিঠির একটু যদি থাকে।

অবশ্য আঠার পাতা ভরে সে আমার প্রতি তার উপেক্ষাই প্রমাণ করত। সেই স্কুলের কলেজের কথা লিখত, বইয়ের কথা লিখত, তার দিদির ছেলে-মেয়ের কথা লিখত, গরম চা খেতে গিয়ে কী রকম করে তার জিভ পুড়ে গেছে, পিসিমা তার কেমন চমৎকার লেবুর আচার তৈরি করতে পারেন, কাসুন্দি খেতে তার কত ভাল লাগে, কলকাতায় কী রকম গরম পড়েছে, কলেজের বাস কী রকম টিকুর টিকুর করে চলে, তাদের বাড়িতে রোজ দুটো-একটা করে ইঁদুর মরছে, কে জানে বেড়ালে মারে, না, প্লেগ হবে, তাদের গরুটা আজকাল চার সের করে দুধ দেয়, রাস্তার ওপারে ডাস্টবিনের থেকে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসে, সেই জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে লেখা হয়েছে, গ্রামোফোনের অনেকগুলো নতুন রেকর্ড কেনা হয়েছে, কলকাতা এবার বৃষ্টিতে তলিয়ে গেল—এই সব।

অনেক চিঠি লিখত মাধুরী, অনেক কথাও লিখত কিন্তু রক্ত-কাঁকরের পথের বুকে যেমন জল পাওয়া যায় না, এই চিঠিগুলোর ভিতরেও তেমনি কোনো দরদ কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারি নি। আছে এগুলোর ভিতর একজন সামান্য নারীর অবৈধ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য ভুল। কিন্তু তবুও এই মেয়েটি আমার জীবনকে করেছিল কী ভীষণ দুরতিক্রম্য। এই নারীটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই বৈষ্ণব কবিতা, কিশোরী প্রেম ও অনেক বিদেশী সাহিত্যের অন্ধকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অপরূপ হয়ে আছে। রূপ ও প্রেমের বেদনা, পাপ ও অভূতপূর্বতা বুঝতে পেরেছি।

পড়তে-পড়তে নির্মলার [?] কয়েকটা ছবি চোখে পড়ল। নির্মলা নিজেও অনেকদিন হয় মারা গেছে; কিন্তু বিধাতা তার কয়েকখানা চিঠি অন্তত আমার কাছে রাখলে পারতেন।

অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গ্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে। সে দশ বছর আগের কথা। পাঁচ বছর ধরে সে আমাকে চিঠি লিখেছে; কখনো দেরাদুন থেকে, কখনো পাহাড় থেকে, কুমায়ুনের থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, বিলাসপুরের থেকে, রামেশ্বরের সেতুবন্ধের থেকে, চিংলিপট্টমের থেকে, ত্রিচিনপল্লির থেকে অনুরাধাপুরের থেকে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়াচ্ছে সে; একবার ধর্মপুরের থেকে লিখেছিল যে যক্ষ্মায় ভুগে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

তার পর আর-কোনো চিঠি পাই নি।

অনেক আগে, ধর্মপুর থেকে তার চিঠি পাবার বছর দুই আগে, গোলদিঘিতে একদিন অবিনাশের সাথে দেখা হয়েছিল। সেও এমনি শ্রাবণ মাস–গিরি মাটির মত অজস্র মেঘে আকাশ ছিল ভরে—কতকগুলো ধুমসো কাল মেঘ গঙ্গপালের মত ইতস্তত ওড়াউড়ি করছিল; দিনের আলো যাচ্ছিল নিভে; দাঁড়কাকগুলো আকাশের গায়ে-গায়ে ইতস্তত মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঘোলা সরবতের মত মেঘের এক খণ্ডে বরফের দানার মত সপ্তমীর চাঁদ বিকেল শেষ না-হতেই হাজির—তার নিচে আসন্ন সন্ধ্যার অজস্র কালো বাদুড়ের দল।

হাঁটছিলাম—হঠাৎ দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণের থেকে কে যেন আমাকে ডাকল; আবছায়ার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা মিলিটারি খাকির শার্ট পরে অশ্বত্থ গাছের নিচের বেঞ্চিতে অবিনাশ বসে আছে।

সেদিন সারারাত ভরে মেঘের...কিন্তু...মন....

অনেক রাতে আমরা স্কোয়ারের বেঞ্চি ছেড়ে ফুটপাতে নামলাম। হাঁটতে-হাঁটতে একবার আমাহার্স্ট স্ট্রিট, করিম চার্চ লেন—আর-একবার মুনলেন্ট, সেন্ট জনের গির্জা—এমনি করে সারাটা রাত কাটালাম।

কী-ই বা করবার ছিল আর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন তখন একটা সমস্যার জিনিস, প্রেমের বেদনা ও জর্জরতার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছেদ ও প্রণয়ের গন্ধও যে জীবন থেকে একদিন নিঃশেষে কেটে যায়। বঞ্চিত হলেও বেদনা থাকে না আর। উত্তর জীবনে মানুষের দুঃখ যে-অন্নকষ্ট নিয়ে, নারীকে নিয়ে একেবারেই নয়, সে আশ্বাস তখনো পাই নি। তাই সারা রাত অবিনাশ কবিতা আওড়াল, চুরুট টানল, অসংলগ্ন কথা বলল, একবার নক্ষত্রের মত অমানুষিক দীপ্তির একবার ছাগলের মত আকণ্ঠমজ্জিত লালসার পরিচয় দিতে লাগল।

অবাক হয়ে ভাবি, অবিনাশ আজ কোথায়? ধর্মপুরের স্যানোটোরিয়ামে সে আজ আর নেই, হয় ত আমার মত নির্বিবাদ, নির্জীব গৃহস্থ হয়েছে কিংবা মাটির তলে হাড় পচছে হয় তার তার।

অবিনাশের বড়-বড় চিঠিগুলো একবার পড়েই রেখে দিতাম, কোনো এক দূর ভবিষ্যতে এগুলো সরস নবীন জিনিসের মত আবার আগ্রহে খুলে পড়ব বলে; চিংলিপট্টম ও মাদুরার কয়েকটা দিন কয়েকটা চিঠিতে খুব বিশদভাবে গাঁথা ছিল; অনুরাধাপুরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনখানা চিঠি ছিল।

বারান্দায় হরিণের ছাল পেতে, কিংবা অন্ধকার রাতে প্রদীপের আলোর কাছে মাদুর বিছিয়ে এ সব চিঠি কোনোদিনও পড়তে পারব না, আমি আর। চিঠিগুলো উঁইয়ের পেটের ভেতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।

কিন্তু একটা পচা হোগলার বেড়া দিয়েও ত এই কাজ হত, কিংবা গর্ভস্রাবের রক্তমাখানো রাবিশ ন্যাকড়া দিয়ে? আমার এই বিশ বছরের সঞ্চয়ের উপর হাত দেবার কী দরকার ছিল?

কিন্তু কাকে আমি প্রশ্ন করি? এই অন্ধ পোকাগুলোকে? আমার অবসন্ন হৃদয়কে? জীবনের দিন-রাত্রির নিঃশব্দ সঞ্চারকে?

যে-খাতাগুলোতে নতুন কতকগুলো কবিতা লিখে রেখেছিলাম—তাও নষ্ট হয়ে গেছে।

এ কবিতাগুলো কাউকে দেখাই নি। অনেকক্ষণ সময় কেটে যায়। অবাক হয়ে ভাবি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখা। ভাবতে-ভাবতে অনেক মুহূর্ত কেটে যায়, এক সময় নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করি এই ভেবে যে আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এমন অনেক অনেক চিন্তা ও কল্পনার সম্ভার ধোঁয়ায় মিশে গেছে যার তুলনায় আমার এ কতিবাগুলো কিছুই নয়।

শেষ পর্যন্ত শেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যও ত এক দিন বরফের নিচে ধ্বসে যাবে। পৃথিবীতে একটি মানুষও থাকবে না।

কিন্তু তবুও থেকে-থেকে মনে হয় আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও আমার কবিতাগুলো ইঙ্গিত ও মূল্য ঢের চমৎকার ছিল, শেক্সপিয়র যা দিতে পারে নি—তাই ত দিয়েছিলাম আমি।

মেজকাকা এসে বললেন, 'উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ'

'সার্টিফিকেট বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

'কার সার্টিফিকেট ছিল?'

'বর্ধমানের মহারাজার'

'হুঁ, তা হলে চাকরি পেলে না যে বড়?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বটে আমাকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই। আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। সেই সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কে-এস শেঠ-এর কাছে যাই। আবগারি ডিপার্টমেন্টে চাকরি আদায় করে নেই।'

'তা শাস্ত্রীমশাই শুনে কী বললেন, হয় ত অপেক্ষা করেছিলেন? সাব ইনস্‌পেক্টর হয়ে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ ফাল হয়ে বেরলাম ইনস্‌পেক্টর।'

গলা খাঁকরে মেজকাকা—'ব্রাহ্ম সমাজে সাধনাশ্রমের সঙ্গে খুব যোগ [?]

ছিল এক সময় আমার—'

'ছিল বুঝি?'

'ভেবেছিলাম জীবনটা ঐখানেই কাটিয়ে দি, কিন্তু,' সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানুষের জীবনের কত রূপান্তর হয়, ভাবছিলাম এই সমাজের বেদিতে চড়ি-চড়ি বুঝি, কিন্তু বছর দুয়ের মধ্যেই আবগারির মোটা তলব।'

'শক্তি যেখানে যায়, সেখানেই কাজে লাগে।'

'তা বইকি, তোমার বাবারই ত শুধু কিছু হল না। চিরটা জীবন স্কুল মাস্টারি করে কাটালেন; শক্তি আমাদের কারো চাইতে কম ছিল কি তাঁর?' গলা খাঁকরে মেজকাকা—'এই ত তিন দিন হল তোমাদের এখানে এসেছি, 'পরশুই আবার কলকাতায় চলে যাব।'

'পরশুই যাবেন?'

'জরুর, যতবার এখানে আসি, দেখি, কী দুরবস্থার ভিতরেই তোমরা আছো। বাহাত্তর বছর বয়সে দাদা কাদা-বৃষ্টি ভেঙে এখনো হেঁটে এক মাইল দূরের স্কুলে যান, তোমার মা চাকরানির মত খাটে—তোমার চাকরি নেই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌমার কষ্ট; নিজেকেও ধিক্কার দি একই ভেবে যে তোমাদের কোনোদিন একটি পয়সা সাহায্য করতে পারলাম না। যতদিন সার্ভিসে ছিলাম মেরে-কেটে কিছু সাহায্য করলেও করতে পারতাম। সেই বড় ভুল হয়ে গেছে, কিছু দেওয়া থোওয়া উচিত ছিল দাদাকে তখন। কিন্তু এখন পেনশন খাচ্ছি, কোনো উপায় নেই তো।'

'আপনার কত পেনশন মেজকাকা?'

'পেনশন আর-কী?'

দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম।

মেজকাকা—'আমাদের খোঁজখবর তোমরা কিছুই রাখো না দেখছি।'

ঈষৎ হেসে কাকার দিকে তাকালাম।

'কত পেনশন তাও জিজ্ঞেস করলে? জানো না কী নিদারুন টানাটানির ভেতর আছি।'

বলে খাকির হাফ প্যান্টের ভিতর দু'হাত চালিয়ে দিয়ে, 'এক জোড়া জুতো কিনতে পারছি না।'

'কেন?'

'পায়ে লাগে। দাদা যখন কলেজে পড়তেন তখনো, এখনো, নিউ কাট [?]

কিন্তু আমার অক্সফোর্ড না হলে চলে না,' একটা হাত তুলে বললেন।

'জুতোর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোল কী রকম হওয়া চাই জানো?'

'কী রকম?'

'ম্যাক্সিমাম ওয়েট সোল,' বলে, বিস্ফারিত পরিতৃপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা।

বললাম—'বেশ।'

খুব অস্বস্তির সঙ্গে—'মেজকাকা, ক দিন টেকে?'

'সে অনেক দিন, সঙ্গে কতকগুলো চীনে বাজারের জুতো রাখতে হয়। আমি যখন যে স্কুলে বেরুই এই জুতো নিয়ে বেরুই। এই তো, যে-জুতোজোড়া পরেছি এ তো অক্সফোর্ড নয়, চিনেম্যানের তৈরি।'

'খুব চরিতার্থতায় দিন কাটছে আপনার।'

'আমার?' ঈষৎ ভ্রূকুটি করে সেজকাকা বললেন, 'কেটে যাচ্ছে এক রমক। অদৃষ্টের দোষ দেই না। কাউকেই গালিগালাজ করবার প্রবৃত্তি হয় না।,'

'কেন দেবেন? সবাই আপনাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন।'

'না, দু'হাত ভরে দেন নি অবিশ্যি। তবে নেমকের চামচের এক চামচে দিয়েছেন বটে।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—'যে যা-দিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতা সব সময় স্বীকার করো। তোমার ত এখানে সকালবেলা মুড়ি খাও। যে-চালের ভাত খাও আমাদের ওখানে চাকর খানশামাও তা খায় না।'

'আপনার জন্য তা বাবা কয়েকসের দাদখানি চাল এনে রেখেছেন।'

'তা এনেছেন বটে; আমাকে দাদখানিই দেওয়া হয়, না হলে আমার অম্বল হয়। বৌঠানও খুব রেঁধে—বেড়ে খাওয়াচ্ছেন আমাকে। কিন্তু এ হল আমার জন্য তোমাদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তোমরা নিজেরা বারমাস যা-খাও তা দেখলে আমাদের ছক্কুর অব্দি চক্ষুস্থির হত।'

'ছক্কু কে?'

'আমাদের বয়; বিহারে বাড়ি, ছাপরা জেলায়, সেখানেও সে তোমাদের চেয়ে ভাল খায়।'

একটু চুপ থেকে—'সাধনাশ্রমে কেমন খাওয়া হত?'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাকা—'মুড়ি যে আমি না খাই তা নয়, মাঝে-মাঝে খেতে ভালও লাগে—কিন্তু এই যে সকালবেলা উঠে তোমরা ডাস্ট দিয়ে চা আর মুড়ি নিয়ে বস, দেখে আমার বড় দুঃখ করে। আমার ওখানে ভাল দার্জিলিং চা কিংবা লিপটনের কফি, রোল, মাখন, ডিম এই ত ব্যবস্থা—'একটু চুপ থেকে, 'তার পর নটার সময় আসে,' তাকিয়ে দেখলাম, চোখ পরিতৃপ্তি ও আত্মমর্যাদায় ভরে উঠেছে, বললেন, 'তার পর এগারটার সময় সবচেয়ে টাটকা মাছ-মাংস, ডাল-তরকারি, ভাজি, চাটনি'। দাদার মত মিছিমিছি জীবনটাকে বঞ্চিত করে কী লাভ।

'না, কোনো লাভ নেই।'

'একটা কষ্ট! খেয়ে-খেয়ে আমার গাউট হয়েছে'

একটু চুপ থেকে, 'বৌমাকে তুমি একটু বলো ত—'

'কী?'

'এই রাত্রের দিকে আমার পায়ে একটু লিনিমেন্ট ঘষে দেয়'

'আচ্ছা।'

'কলকাতায় দিত ছক্কু মালিশ করে। কিন্তু এখানে ত তোমাদের কোনো চাকর-বাকর নেই?'

'না, চাকর আর রাখা হয় নি।'

'ভালই করেছ। চাকর পুষতে আমার মাসে নিট পঞ্চাশটি টাকা খরচ হয়ে যায়। অথচ নেমকহারামের ধাড়ি সব, ও-পাপ রাখতে হয় না, তা ছাড়া দাদার যা ইনকাম, চাকর-বাকর রেখে মুখে রক্ত উঠে বুড়ো বয়সে মরবে এ-মানুষটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও দিতে পারি আপনার পায়ে মালিশ করে।'

'আচ্ছা, তুমি কেন দেবে? বৌমা থাকতে—সেটা কি ভাল দেখায়? বৌমার যদি কোনো আপত্তি থাকে—'

'না, আপত্তি কিছুই নেই।'

'হয়ত লজ্জা করতে পারে—নিজের শ্বশুরকে যেমনটি দেখে আমাকে তেমনটি নাও মনে করতে পারে হয় ত।'

'কেন মনে করবে না? আপনি বাবার সহোদর ভাই।'

'আহা, এদের মনের মধ্যে কোথায় কী যে খোঁচ আমরা কি তা বুঝতে পারি?' গম্ভীর করে, 'নিজের স্ত্রীকেও কি ছাই আমি ভাল করে চিনি?'

'আমিই তা হলে মালিশ করে দেব মেজকাকা।'

'তাই দিও। বৌমার নাম যে মুখে এনেছিলাম—বল তো তোমার বাবার কাছে গিয়ে খৎ দিয়ে আসি।'

'গাউট হয়েছে আপনার কত দিন থেকে?'

'ডিম-মাংসের পরিণাম আর কী? তবে বাড়াবাড়ি হয়েছে দু-তিন বছর ধরে।'

'মাংস-ডিম খান এখনো?'

'খুব কম খাই। তবুও ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে এপেন্ডিসাইটিস হয় নি, স্টোন হয় নি, গলস্টোন হয় নি, ব্লাডপ্রেসার হয় নি, গাউটের উপর দিয়ে আপদ গেছে সব।'

'শুনলাম, সেজকাকার নাকি ব্লাড প্রেসার হয়েছে?'

'কার? রমেশের? তা তুমি আজ শুনলে? গত বছর ত মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'জানো না? বাপের ভায়েদেরও খবর রাখো না?' একটা হাত তুলে মেজকাকা—'তোমাদেরই বা বলব কী? দাদাই কি খোঁজখবর রাখেন আমাদের?

কোলের থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে মেজকাকা—'বিধাতার কৃপায় আমি তিন'শ চার 'শ টাকা নেপশান পাচ্ছি। কাঁচা টাকায় অনেক ঝাল মিটে যায় কিন্তু তবুও আমাদের মনে প্রাণে কি কোনো বেদনা থাকতে পারে না? যাক, ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, বিচারও করবেন তিনিই। বার 'শ টাকা মাইনে পেয়ে ডিম-মাংস, হ্যাম, বেকন, কোকোজ্যামের পিণ্ডি চটকে জীবন কাটিয়ে দিল রমেশ। রেস খেলে, বছর বছর একটা ব্যবসা, দিন-রাত সিগারেট আর ইংরেজি বই, ব্লাডপ্রেসারের কী দোষ?

'পুলিস ইনস্‌পেক্টর হয়ে এই সব বই পড়েন সেজকাকা?'

একটু আশ্চর্য হয়ে মেজকাকার দিকে তাকালাম।

'ওপেন হাইম, এডগার ওয়ালেস এই সব। অবসর পেলেই দিন-রাত এই সব নিয়ে পড়ে থাকে।'

'ওঃ এইগুলো?'

'এইগুলো অত্যন্ত ম্লেচ্ছ বই।'

'সময় কাটে মন্দ না।'

'চঞ্চল দিয়ে এই সব বই পোড়াতে হয়।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্তঃসার শূন্য করে ছাড়ে,' ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে মেজকাকা, 'সব সময় একটা নিষ্ঠাহীন চঞ্চলতা। রমেশের হয়েছেও তাই। মানুষের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করবার মত না-আছে রুচি, না আছে শক্তি—ভগবানকে নিয়ে রোজ দু'দণ্ড বসবার মত অবসর সে খুঁজে পায় না। একখানা ভাল বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিনরাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল নিয়ে।'

'ক্রাইম নভেল অবশ্য আমি পড়তে পারি না।'

'শয়তান ছাড়া কেউ পারে না।'

'কিন্তু সেক্স নভেল পড়েছি ঢের।'

'আর পোড়ো না; তার চেয়ে বরং হকিং পড়ো'

'হকিং?'

'হ্যাঁ আর হাচিংসনের। অবিশ্যি এ সব বই কোনোদিন পড়ব না আমি; পড়লে না-হয় রাস্কিন পড়ব আর-একবার, কিংবা টলস্টয় অথবা—।'

'মেজকাকাকে বললাম, 'নভেল কাড়ে সেজকাকা ইংরেজি লিখতে শিখেছে বেশ।'

'হুম, সাহেবদের সঙ্গে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না।'

'পারে না?'

'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে এ উন্নতি হল কী করে? সামান্য পোস্ট থেকে একেবারে গ্রেড?'

'আমড়াগাছি! খোশামুদি! তা ছাড়া আবার কী? পায়ে তেল মেখে-মেখে। আহাপেকেটে ওর সব সময়েই তেল। রমেশের জন্য তেল যোগাড় করতে গিয়ে বি-ও-সি সাবাড় হয়ে গেল।'

হাসছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজকাকা—'অত আমড়াগাছি যদি আমাকে দিয়ে করাতেন ভগবান, তাহলে সাঁ করে কমিশনার হয়ে যেতাম। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে হত না আর।'

গলার আওয়াজের ভিতর যেমন বিষ, তেমন ঈর্ষা। তেমনি ক্ষোভ ও যন্ত্রণা।

ছটফট করতে করতে মেজকাকা—'বার'শ তলব মারলেই যদি মানুষ ভাল ইংরেজি বলতে পারত তা হলে সুরেন বাঁড়ুয্যে আনন্দমোহন বোসকে অত কষ্ট করে ইংরেজি শিখতে হত না। একটা দারোগার কাজ নিলেই ল্যাটা চুকে যেত। টেন্স-এর জ্ঞান নেই।'

'কার?'

'রামেশের। একটা থার্ড ক্লাস-এর ছেলেও ত বোঝে যে যদি পাস্ট টেন্স....'

কিন্তু চুপ করে গেলেন মেজকাকা। গ্রামারের অনাবশ্যক আলোচনার কোনো দরকার বোধ করলেন না।

গলা খাঁকরে, 'আই-সি-এস-এর কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়েই দেমাক বেড়েছে রমেশের। তোমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে? একখানা চিঠি লিখে শুধোয়? একটা পয়সা পাঠায়? দাদা চিরটাকাল ভেক ধরেই গেলেন—যেন নামাবলি গায়ে বৈরেগি ঠাকুর; রক্ত নেই আঁচ নেই, যেন ঠাণ্ডা শালগ্রামটি। তা না হলে রামেশের এত বাড় বাড়ে? বার'শ টাকা মাইনে পায়, ছ'শ টাকা দাদাকে পাঠাতে পারে না?'

'আমার মেয়ে বি-এ পাস করে টিচারি করছে, বিয়ে করছে না। মদ-গরু-খাওয়া সিভিলিয়ানদের সঙ্গে বিয়ে দেব তাই বলে? রমেশটা ত দিল।'

সন্ধ্যার সময় মেজকাকার পায় লিনিমেন্ট মালিশ করে দিচ্ছিলাম। বললেন, 'মালতীর জন্য একটা ছেলে দেখে দিতে পার? নিতান্ত সারকেল অফিসার, সাব ডেপুটি যেন না হয়। করে খেতে পারে যেন, অন্তত ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট।' খানিকক্ষণ অশোভন বিস্তব্ধতার পর মেজকাকার একটা ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাস। 'মালতী অবিশ্যি নিতান্তই সাদাসিধে মেয়ে। চেহারায় চরিত্রেও।'

'তাহলে এদের একজনকেই বিয়ে করুক না কেন।'

'তা হয় ত করবে না।'

'কেন?'

একটু স্বদেশীর অভিমান আছে কি না আমার মেয়ের। মাঝে-মাঝে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'সে ত বেশ ভাল কথা।'

'কিন্তু বর পেলে বিয়ে করতে পারে। ধরো, বিলেত-ফিরেত আই-সি-এস যদি ওকে বিয়ে করতে চায়। একজন সাব-ডেপুটির জন্য মালতী তার স্বদেশীকে ত স্যাকরিফাইস করতে পারে না; কিন্তু স্বদেশীর জন্য সিভিলিয়নকে স্যাকরিফাইস করা বাড়াবাড়ি। এক সুভাষ বোষ করতে গিয়েছিল। হত্যা দিয়ে পড়েছে গিয়ে তাই। এ-সব ভগবানের দাড়ি ধরে টানা-হেঁচড়া কি আমাদের মত মানুষের সাজে রে ভাই? তা আমাদের এক রকম ঠিকই আছে সম্বন্ধ।'

'কার সঙ্গে?'

'অঘোরা মজুমদারের ছেলে বিলেত গেছে সিভিলিয়ান হবার জন্য। ফিরে এসে মালতীকে বিয়ে করবে। মালতীও কোনো আপত্তি করবে না। স্বদেশী করে ভাওয়ালি যাবার সাধ হয় নি ত।'

দেখতে-দেখতে এই মাংসপিণ্ড ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে মেজকাকাকে অবিশ্যি জেগে উঠতে হল।

মেজকাকা আমাদের রান্নাঘরে গিয়ে কোনোদিন খান নি—রান্নাঘরে মা কী করে রাঁধে, বা, বাবা ও আমরা কী করে খাই, সে সব ইতিহাস তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তিনি জানতে চান না, জানবার ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। বিশেষত এই বর্ষাকালে, এই কাদামাটির দেশে পাড়াগাঁয়ে এসে পিছল পথে হাঁটতে তিনি রাজি নন। পায়ে কাদা লেগে যেতে পারে, অন্তত ভেলভেটের চটিজুতো নষ্ট হয়ে যাবে; ছাতার আড়ে বগলে ফতুয়া যাবে ভিজে; টর্চ আছে বটে কিন্তু তবুও রাত করে বাইরে নামলে সাপখোপের সম্ভাবনাও নিদারুণ।

বিকেলবেলা আলো ফুরাতে না ফুরাতেই তিনি বেড়িয়ে এসে দক্ষিণ দিকের ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেন।

এসে পিসিমাকে বলেন—'আট আনার পয়সা গাড়ি ভাড়া নিলে। এখানকার গাড়োয়ানেরা কান মলে পয়সা আদায় করে নেয়।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এলাম নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়?'

'তা বেশ, ঝাউয়ের বাতাস কেমন লাগল?'

'এদেশে শয়তান আর উলুক থাকে বাতাসে,' একটু থেমে, 'বাতাস আলমোড়া পাহাড়ে, পাইনের বনে।'

অনেকে আমরা স্তম্ভিত হয়ে মেজকাকার দিকে তাকাই।

'গত এপ্রিলে গিয়েছিলাম—'

'কোথায়? আলমোড়ায়?'

'আলমোড়া, মুসুরি, দেরাদুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বাড়ির কোনোদিন কেউ এ সব দেখে নি আর। দেখবেও না কোনোদিন।

বাবা একটু বিস্মিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো এক বিরাট সাদা মেঘখণ্ডের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে দূরত্বের সৌন্দর্য ও বিস্ময়কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

'প্রায় সাড়ে বার'শ টাকা খসে পড়ল—'

বাবা চমকে উঠে তাকালেন মেজকাকার দিকে।

'তা কুমায়ুনের পাহাড়ে-পাহাড়ে হোটেলে-হোটেলে থাকবে, টাকা খরচ হবে না?'

পিসিমা ফোড়ন দিয়ে, 'টাকা তো মেজদা নিজেই উপার্জন করেন, কারুর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় না ত'। মেজকাকা আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারে পিসিমার দিকে একবার তাকান, আমাদের সকলের দিকে একবার।

বললেন—'নিয়েছি সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ করে।'

'কেন ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে গেলেন না মেজদা?' পিসিমা বললেন।

'যাঃ যাঃ! আমি কি রমেশটার মত বেল্লিক যে ঘুঘু সিভিলিয়ানরা যা করতে ভয় পায় আমি তাই করে বসব।'

'গোঁফে হাত বুলিয়ে নিয়ে মেজকাকা—'মালতী গেল, মালতীর মা গেলেন, বিজয় গেল, একটা বেয়ারাকেও সঙ্গে নিতে হল—'

'আহা, যদি পাশ পেতেন মেজকাকা, আপনার এত টাকা খসল!'

'দেখো, তোমরা এই দরিদ্রতার ভিতর কায়ক্লেশে, থেকে-থেকে বড় প্রবঞ্চিত হয়েছ, মানুষের আত্মাকেই ফেলেছ হারিয়ে; তোমরা ভাব টাকাই সব; কিন্তু সৌন্দর্য ও ভগবানের জন্য আমাদের তেমন পিপাসা থাকলে ডাঙা দিয়ে তিনি যে আমাদের নৌকা চালিয়ে নিতে পারেন তা তোমরা জানো?'

বাবা এই পর্যন্তও বৈঠকে ছিলেন; এবার আস্তে চোখ বুজে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন; তাকিয়ে দেখলাম একটা টুলে বসে স্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছেন নিবিষ্ট একান্ত মনে, যেন কোনো বাধা, কোনো পরাজয়, কোনো দীনতার কুয়াশা কোনোদিনও ছিল না জীবনে।

মেজকাকা—'কুমায়ুনে গিয়ে ভগবানের সত্যকে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে আসতে পেরেছি।'

মা বললেন, 'কুমায়ুনে কেন, এখানে বসে পারা যায় না? যেন কুমায়ুনের তেমন এখানে বসেও পারা যায়।'

'সব সময়েই জীবনের জীর্ণতার ছোট নজরের কথা বলো না বৌঠান।'

মেজকাকা—'তোমাদের ভিতরে এলে ভগবানের ভাব নিয়ে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না বৌঠান।'

'কেন?'

'না, যেখানে জীবন মানে জীবন্মৃত অবস্থা, অর্থের দুর্গতি যেখানে মানুষকে দিয়েছে সঙ্কুচিত করে, সেখানে সৌন্দর্যের কথাই বা কী ভাবব, আনন্দের, বিধাতার স্পর্শই বা পাব কী করে? তিনি ত আনন্দের শুধু নয়, তিনি ত বেদনা—বললেন রবি ঠাকুর কিন্তু সে বেদনার ভেতরেও একটা রূপ আছে বৌঠান, তোমাদের ব্যথা ত শুধু কুৎসিত'—মা অধোমুখে বসে রইলেন।

'সৌন্দর্য ও ভগবানকে দেখলেন মেজকাকা?'

'হ্যাঁ'

'কোত্থেকে?'

'কুমায়ুনেই'

'হোটেলের জানালায় বসে?'

মেজকাকা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'হোটেলের মেনুই বা কী ছিল? কী আন্দাজ পঞ্চরং চলত?' কে যেন আস্তে বললে।

'[ছেলেমেয়েরা] গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ গিয়েছিল কয়েকজন।'

'বড্ড ঝালাপালা করে তোলে নি?'

'না, শান্তশিষ্টই তো ছিল'

'পরমাত্মা ও পরমেশ্বর তাদেরও বঞ্চিত করেন নি?'

'না, কেনই-বা করবেন? তাদের টাকা আছে বলে? সূচের ছ্যাদা দিয়ে উট খ্রিস্টিনি কথা, ও-সব সেকেলে ঢুকতে পারে, কিন্তু ধনী স্বর্গে যেতে পারে না সে-কথা আমি মানি না। টাকা থাকলে স্ত্রী সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায়, ভাল জায়গায় যেতে পারি, ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে থাকা যায়, পরিপাটি খাওয়া-পরা হয়, ঘুম হয় চৌকোশ, মনে শান্তি থাকে আমাদের জীবনের এ-রকম সৎ সচ্ছল ব্যবস্থার ভিতরই ভগবান আমাদের হৃদয়ে নামবার ভরসা পান।'

'হৃদয়টা ভেলভেটের কুশনের মত না হলে তিনি নামেন না বুঝি?'

শুনে মেজকাকার বৈঠকি অন্তরঙ্গতা এক-আধ মিনিট থেমে রইল।

আমার প্রতি বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ শুধু মেজকাকাই হন নি, পিসিমাও হয়েছেন, মা পর্যন্ত।'

তাই ত।

রাত নটার সময় ঘুমের থেকে উঠে মেজকাকা, 'বৌঠান, বৃষ্টিতে ভিজে খাবার নিয়ে এসেছে দেখছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে বসে একটা হাই তুলে, 'এই অন্ধকার রাত-বিরেতে ঝড়-বাদলে কী করে যে তোমরা চলাফেরা কর বুঝি না, একটা লণ্ঠন নাও!'

'লণ্ঠন? ও বড্ড ঝামেলা ঠাকুরপো'

'চোখ জ্বলে বুঝি? একটা কুপি অব্দি চাই না?'

'কুপি মাঝে-মাঝে ব্যবহার করি বটে ঠাকুরপো'

'আমাকে ঠাকুরপো ডোকো না—'

'ডাকব না?'

'বরং সুরেশবাবু ডেকো।'

'মেজকাকা, মাথা তুলে, 'কিংবা তাতে যদি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা জড়িয়ে গেছে মনে করো, তা হলে সুরেশ দা'

সকলেই চুপচাপ।

মেজকাকা, চশমা চোখে আঁটতে-আঁটতে, 'তোমার শাড়িও দেখছি ভিজে গেছে বৌঠান। একটা ছাতাটাতা ব্যবহার করো না কেন? বাঃ পোলাও রেঁধেছ আজ?'

পোলাও মেজকাকার জন্যই রাঁধা হয়েছিল, ছোট এক ডেকচি আন্দাজ।

'ইলিশ মাছ ভাজাও ত গোটা দশেক দিয়েছ দেখছি—বেশ বেশ!'

খেতে-খেতে, 'আচ্ছা এই তেপয়াটা তোমরা কোথায় পেলে—যেটার ওপর থালা রেখে খাচ্ছি?'

'কেন? অসুবিধা হচ্ছে?'

'না, সে জন্য না, এমন ছবি-ফুল-কাটা তেপয়া তো পাড়াগাঁয় দেশে দেখা যায় না বৌঠান।'

'উনি কোত্থেকে এনেছিলেন।'

'দাদা কি খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ, দাদার খাওয়া হয়ে গেছে বুঝি—'

পিসিমা বললেন, 'দাদা, খেয়েছেন ঐ রান্নাঘরে গিয়ে।'

'কেন, কেন, এ-রকম, ব্যবস্থা কেন বৌঠান? আমি খাব টেবিলে বসে, আর তিনি জল-ঝড়ে ভিজে—তেপয়াটা কি কাঠের, বড় বৌঠান?'

'দেখত খোকা, সেগুনের বোধ করি।'

বললাম, 'হয় ত মেহগিনির।'

মেজকাকা চোখ পাজলে হেসে—'পাগল না ছাগল, হবে বড় জোর জারুলের। দাদা ত কিনেছেন—না হয় কেরোসিন কাঁঠাল কাঠের।'

মা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে জানলার দিকে তাকালেন। কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

মেজকাকা, 'আমাদের কলকাতার বাড়ির আসবাব পত্র সমস্ত ওক কাঠের কিংবা মেহগিনির। দেখে আসবে গিয়ে বৌ একবার।'

পিসিমা—'মেজদার বাড়ি, কিসে আর কিসে, বাঘে আর রামছাগলে কী আর, ওযে ইন্দ্রের বৈঠকখানা।'

মেজকাকা চশমার ভিতর দিয়ে বিস্ফারিত চোখে আমাদের সকলের দিকে এক-একবার তাকালেন।

খেতে-খেতে, 'তোমরা যে ভরন-কাঁসার থালায় করে ভাত দাও, আমাদের ওখানে ত সে রেওয়াজ নেই, আমরা খাই ডিশে, ড্রেসডেন চায়নার ফুলকাটা ডিশ দেখিস নি? আমাদের চাকর-বাকরও সেখানে থালায় খেতে চায় না। সববায়ের জন্য ডিশ। পোলাওটা কেমন কড়কড়ে হয়েছে, ঘি দিতে কার্পণ্য করেছ বৌঠান।'

পিসিমার দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'জানলে, পোলাও রাঁধে তোমাদের মেজদিদি—ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, জাফরান কত কী যে দেয়। যেমন পোলাও, তেমনি ছানার পায়েস, তেমনি মাংস—সুরেন খাস্তগিরের মেয়ে তো আর যে-সে জীব নয় বাবা।'

'কিন্তু মেজদিদি তো ইদানীং খাটেই শুয়ে থাকেন।'

'হ্যাঁ ইদানীং থাকেন বটে—'

'প্রায় দশ—বার বছর ধরে আমি ত তাকে খাটে শুয়ে-শুয়ে পান জর্দা—'

বাধা দিয়ে মেজকাকা—'সেই ভাল রে; বুড়লোকের বৌ, উঠবার কী দরকার বল? আট-দশটা বাবুর্চি খানশামা বরকন্দাজ রয়েছে, গিন্নিরই যদি নিজের হাতে নেড়ে কাজ করতে হল তো এ অনামুখোগুলোকে রাখা কেন?'

মার দিকে তাকিয়ে মেজকাকা, 'তুমি আজ পোলাও রেঁধে বসলে বৌঠান, কড়কড়ে পোলাও। আমি ভেবেছিলাম টেঁকির শাক একটু কাসুন্দি দিয়ে খাব।'

মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে, 'কাল খাবেন।'

'কাল সকালে?'

'বেশ, তাই হবে।'

'কাল ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে?'

বাজারে আনতে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, গঙ্গার ইলিশের মত স্বাদ ত এতে নেই।'

'যা বর্ষা—এত বৃষ্টিতে এদেশের ইলিশের ঝাঁক ধুয়ে জল হয়ে যায়। ভাল মাছ পাবেন বোশেখ-জ্যৈষ্ঠতে।'

'ভাল হোক, মন্দ হোক, ইলিশই যেন আসে। আর খুব বড় দেখে চিংড়ি, গলদা, আমার জন্য মাছের ডিমের বড়া করো, মুর্গির ছোট ডিম ওমলেটের মত করে ভেজো। কুমড়ো ফুল পাওয়া যায়? ব্যাসন দিয়ে ভেজো তো, বড়ি দিয়ে একটা পালং শাকের তরকারি রেঁধো তো; তোমাদের গেরস্ত ঘরে আমচুর আছে না বৌঠান?'

'আছে।'

'থাকবারই কথা; আমচুরের টক মন্দ লাগে না। যারা বাগিয়ে রাঁধতে পারে তাদের হাতে। আমাদের বাবুর্চিটা শিখেছে—মালতী শিখিয়েছে। মালতী একজন পাকা গিন্নি, বুঝলে!'

'তা হবেই তো, বড় লোকের মেয়ের হাঁটতে-কাশতেও রূপ খুলে যায়।'

'তবে, এসব ধরনের রান্না সে রাঁধে না, কাটলেট, কাস্টার্ড, পুডিং।

মা—'কাস্টার্ড, পুডিং কী?'

মেজকাকা দাঁত বার করে হেসে, 'সে আছে এক রকম মাকাল ফল। যাক্ তুমি, এখন এঁটো পাত কুড়োও বড় বৌ। দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমাদেরই রাত বাড়বে।' এঁটো কুড়িয়ে থামা নিয়ে মা চলে যাচ্ছিলেন। মেজকাকা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে, 'আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুব মারবে বুঝি বৌঠান?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'কোথায় চললে?'

'ঘাটে।'

'থালা বাসন মাজতে?'

'হ্যাঁ'

'এই অন্ধকার ঝড়—বৃষ্টির মধ্যে?'

'এ কি আজ নতুন, ঠাকুরপো।'

'তোমাদের কর্মের ভোগ ভোগো গিয়ে। আশা করি আসছে জন্মে তোমাদের মেজ বৌর মত খোঁচকপাল নিয়ে পৃথিবীতে আসবে।'

'খোঁচকপালে নয়নখান চিরকাল'—বলে হাসতে-হাসতে মা অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়লেন। আমিও চলে যাব ভাবছিলাম; মেজকাকা র‍্যাগটা টেনে নিয়ে গায়ে-পায়ে ভাল করে জড়িয়ে, বালিশে ঠেস, দিয়ে, 'এই অন্ধকারের ভিতরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝলি।'

'কোথায় বেড়াচ্ছেন?'

'আঁদারে-বাঁদারে বিলে-জঙ্গলে, বড় বৌ বাসন ধুতে গেলে সেই ঘাটের সিঁড়িতে।'

'পিসিমা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে, 'তার মানে?'

'ও কীরে ভয় পেয়ে গেলি?'

'তুমি ভূতের কথা বলছ?

'ব্রাহ্মণ মানে বুঝি ভূত? আচ্ছা হাবা'

'তবে কী মেজদা?'

'না রে বাবা আমাকে জড়াতে আসিস নি; মেয়ে লোক আর পেত্নির কাণ্ডে ঢের ঘেন্না আমার। ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোস। ব্রাহ্মণের মানে বলে দিচ্ছি।'

পিসিমা গিয়ে বসলেন।

মেজকাকা—'রাতেরবেলা নামটা নেব?'

'ওঃ বুঝেছি, থাক, নিয়ে দরকার নেই।'

'কিংবা রাতেরবেলা 'লতা' বললেই হয়। লতার ভিতর ব্রাহ্মণও আছে জানিস।'

পিসিমা ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'থাক মেজদা, এসব থাক এখন।'

'গোখরো সাপ জাতে ব্রাহ্মণ, কালনাগিনী ব্রাহ্মণী।'

আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়িতে অন্ধকার বৃষ্টির মধ্যে মা এত বছর ধরে তো অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে আসছেন। গভীর রাতে ঘরের ভিতর একবার নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চার শুনি। গুপুরি কাটার শব্দ, গুনগুন করে খানিকটা গান; বুঝি মা সারাদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরেছেন; এমনি করে চৌত্রিশ বছর দেখলাম; একদিন যদি এই স্নিগ্ধ আশ্বাস ও উপলব্ধির পথে অন্ধকার বাধা এসে আঘাত দেয়, তা দিতে পারে; সৃষ্টির নিয়মই ত আঘাত দেওয়া। বেদনা ও অক্ষমতার কী গভীর সমুদ্র চারিদিকে; উপহাসের কী অপরিসীম ধূসর পাণ্ডুর দিনবলয়। এমনি বাদলের অমাবস্যার রাতে (সকলেই তো আর নৈনিতালের উজ্জ্বল হোটেলে ভগবান ও সৌন্দর্যের সন্ধানে যেতে পারে না,) কত চাষি ধানের ক্ষেত্রে ফিরছে, পাটের চারার ভিতর ঘুরছে; কত বধূ খাল-বিলের কাছে বসে।

পর দিন সকালবেলা বাবা, 'এই ত তোমার কাকা এখানে রয়েছেন। ইনি থাকতে-থাকতে এঁকে চাকরি-বাকরির কথা বলো না!'

চুপ করে ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা—'তুমিই বলো, সেটাই ভাল হবে; জানো ত এ সব বিষয় নিয়ে আমি কোনোদিন কথাবার্তা বলি না কারুর সঙ্গে।'

দক্ষিণের ঘরে গেলাম; কাকা চা খাচ্ছিলেন।

কাগজওয়ালা রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল—একটা 'এ্যাডভান্স, রেখে কাকাকে, 'পড়বেন?' হাত বাড়িয়ে কাগজ তুলে নিয়ে—'বেশ, পড়তে আমার আপত্তি নেই; খবর না পেয়ে কত দিন মনে হচ্ছিল [অন্ধকারে] পড়ে আছি। তোমরা এ-রকম জেলখানায় কী করে থাক, বলো ত?'

একটু হেসে, 'আমি ফ্রি রিডিং রুম-এর থেকে নিয়ে পড়ে আসি।'

'আর তোমার বাবা?'

'তিনি কাগজপত্র বড় একটা পড়েন না।'

'মনে-মনে ভাবেন বুঝি কাগজের ভিতর বলাৎকারের গল্প ছাড়া আর-কিছু নেই? চশমাটা, এটাচি কেসে, দেখতে পারছি না, এটা কী কাগজ রাখলে তুমি?'

'এ্যাডভান্স'

'আনন্দবাজার বিক্রি হয় না এখানে?'

'হয়'

'তাই ত রাখলে হত, কিংবা স্টেটস্‌ম্যান, বাসি দুধে চা করা হয়েছে বুঝি?'

'কই না ত।'

'তা হবে, বাসি দুধেই করে দিয়েছে বোধ করি। বৌঠান তো ঠাকুরপোর জন্য টাটকা দুধ-দুধ বলে খুব দহরম-মহরম করছিল।'

'মা রান্না ঘরে থেকে, 'টাটকা দুধেই করা হয়েছে।'

মেজকাকা—'বেশ, আমি রাজা হয়ে গেছি।'

পিসিমা—'হবে; এটুকুর জন্য বৌঠান কি আর বাড়িয়ে কথা বলবে? তবে তোমাকে বলি কি মেজদা, এরা দুধ জাল দিতে জানে না। আঁচ পাকতে দেয় না, কাঁচা আঁচে চড়িয়ে সমস্ত দুধ ধোঁয়ায় নষ্ট করে ফেলে।'

'মরি, চায়ের পেয়ালটারই-বা বাহার কত।'

'দাদা কিনেছিলেন; মোক্তারের পছন্দ।'

কাগজটা তুলে নিলাম।

মেজকাকা—'তা পড়বে? তুমিই পড়—'

'আপনি পড়বেন?'

—'না, খেতে-শুতে পড়তে পারি না আমি।'

দু-চার মিনিট নেড়ে চেড়ে কাগজটা রেখে দিয়ে বললাম, 'বাবা বলছিলেন—'

'কী বলছিলেন?'

'আমার জন্য চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা কোথাও করে দিতে পারেন?'

একটু চুপ থেকে মেজকাকা, 'দাদা আমাকে নিজে এসে বললেই পারতেন—'

—'উনি এসব বিষয়ে কাউকে বলেন না বড় একটা—'

—'তাঁবেদার পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে; ছেলের দায় যে বাপেরই দায়—তা জান, আমি আর রমেশ, কখনো ছেলেদের পাঠিয়ে দেই না। মুরুব্বিদের কাছে গিয়ে নিজেই তাঁবেদারি করি। এই ত সংসারের নিয়ম।'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে, 'দাদা চিরটাকাল ফাঁকি দিয়েই বললেন।'

'পিসিমা—'সে যাক্; সে কেঁচো খুড়ে কী-আর লাভ হবে মেজদা? আপনাকে যখন এসে ধরেছে হেম, তখন একটা ব্যবস্থা দিন।'

'তোমরা মনে কর আমি একেবারে লাট সাহেব; চাকরি আমার পকেটে।'

পিসিমা গলা খাটো করে—'আজকাল চাকরি-বাকরির যা হা-পিত্যেশ, কপালে অনেক পুণ্যি না থাকলে কেউ পায় না।'

মেজকাকা—'মানুষের চাকরি জুটিয়ে দেয় শ্বশুর কিংবা মামা। তোমার শ্বশুরকে খুঁজেছিলে?'

পিসিমা—'ওর শ্বশুর তো নেই।'

—'নেই? কী হ'ল তার?'

—'অনেকদিন হল মারা গেছেন।'

—'তবে এমন জায়গায় বিয়ে করতে গেল কেন?'

—'সে ভুল হয়ে গেছে, শোধরাবার উপায় নেই তো এখন আর।'

মেজকাকা—'বেঁচে থাকতে তোমার শ্বশুরমশাই করতেন কী?'

—'কোন একটা স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।'

—'ম্যানেজার না, নায়েব?'

—'ম্যানেজার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা সেখানে গিয়ে নায়েবি করো না তুমি।'

পিসিমা—'হেম নায়েবি করবে? তা পোষায় না; সে ভুঁড়ি কোথায়? তার চেয়ে মাস্টারি করলে মানায়।'

—'সেখানকার নায়েব এখন কে?'

—'জানি না।'

—'ম্যানেজারই-বা কে?'

—'কী একজন ব্যারিস্টার।'

—'তোমার শ্বশুর কি ব্যারিস্টার ছিলেন?'

—'না।'

—'তবে?'

—'বোধকরি বি-এল পাস করেছিলেন কিংবা—'

—'ফেরেব্বাজ নিয়ে জমিদারি চালিয়ে নিয়েছে তো?'

খানিকটা গলা খাঁকরে—'আর ভুইএগ্রা, তোমার, মাতা তিনি করেন কী?'

—'তিনি পোস্ট অফিসে—'

—'চিঠি সর্ট করেন বুঝি?'

—'রেটিস্ট্রেশন ক্লার্ক বোধ হয়।'

-'যাক, তবুও ভাল।'

—'ছোট-খাটো জমিদার যেমন আছে, তেমনি আমার শালা ছোট-খাটো কাজ করে—'

—'শালা কত টাকা পায়?'

—'পঁচিশ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড়ের মধ্যে বিয়ে করলে তুমি?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'অবিশ্য চাকরির উমেদারির জন্য আমার কাছে এসেছ, দাদা দিয়েছেন পাঠিয়ে—তা অনেক বড়-বড় ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ আছে বই কি—'

—'তা হলে—'

—'এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার, মিনিস্টার।'

—'তবে তো আপনি চেষ্টা করলেই পারেন।'

—'না, বেঙ্গলে কিছু হবে না।'

—'কেন?'

—'বড় ছেলেটাকে ইউ-পি-তে পুলিশে ঢুকিয়ে দিয়েছি। মেজটা বেহারে আবগারি ইনস্পেক্টর। বিজয়কে নিয়েই একটু মুশকিলে পড়েছি? হারামজাদাটা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারত যদি, এক এস-এস-আই কি টি-আই, করে দেব আর কী। আমার আলাপ-পরিচয় সব আগে।'

—'বেশ আগেই হোক।'

—'সে বাঙালির হয় না, আদব-কায়দা জানে পশ্চিমি মুসলমান, বুঝলে? এক-একজন আমাকে নিয়ে কী যে করে উঠবে বুঝতে পারে না। সে আমার পা ধুয়ে জল খেলে যেন কৃতার্থ হয়।'

একটু চুপ থেকে—'কলকাতায় অনেক ডিপার্টমেন্টেও আমার খাতির; সুরেন দাশগুপ্তকে চেনো?'

—'কোন সুরেন দাশগুপ্ত?'

—'আবার কোন সুরেন দাশগুপ্ত—বাংলাদেশে কটা সুরেন দাশগুপ্ত থাকে? তেলের কারবার করে লাখ টাকা করে ফেলেছে।'

—'আমি ভেবেছিলাম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।'

—'দূর দূর! সাত ছেলে। এক ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ইনকামট্যাক্সে চাকরি দেবার জন্য। জুটিয়ে দিয়েছি; এই তো ছ মাস আগে।'

—'আমাকেও দিন না।'

—'ভেকান্সি নেই আর?'

পিসিমা—'সুরেন দাশগুপ্তের ছেলেকে না দিয়ে ও-কাজটা হেমকে দিলে হত মন্দ না।'

—'আহা, সে ছেলে এসে যে আমাকে বাবা ডাকল।'

একটু চুপ থেকে—'বেশ ছেলে! অত বড় তেলের কারবারের মালিক হল বাপ, অথচ ছেলের একটুও ভড়ং নেই। সাদাসিধে। গান্ধী ক্যাপ মাথায় দেয়। মালতীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—দিব্যি ঝাড়া ঝাপ্টা।'

বললাম—'অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে'

—'আলাপ তো আমার সব ডিপার্টমেন্টেই আছে—'

—'তা হলে কলকাতায় গিয়ে এই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দেখা করব—'

—'কাকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবে, তাও আবার অনুমতির দরকার হয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, এই সম্পর্কে?'

—'এই ডিমটা পচা না কি রে?'

—'কই? না ত।'

—'কেন, ছোট ডিম।'

—'কেমন হাঁস-হাঁস মনে হচ্ছে।'

—'না, না, কাল আবদুল্লার কাছ থেকে রাখল বৌঠান।'

বললাম—'ডিমটা ভালই, তা তোমার? [আপনার) সঙ্গে চাকরির সম্পর্কে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব?

—'ছ'মাস আগে যদি দেখা করতে একটা কিছু করা যেতে পারত।'

—'আবার সুযোগ আসবে।'

—'তোমার বাবার যেমন এসেছে।'

—'তদবির করতে দোষ কী?'

—'তুমি গেলে না কেন?'

—'যাওয়া হয়ে ওঠে নি; বিশ বছর আগের কথা, তখন রুচি প্রস্তুতি ছিল অন্য রকম।'

—'কাজ শিখতে পারতে কিংবা প্লামবার অথবা ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এর কাজ। এর কত রকম ডিপার্টমেন্ট আছে।'

—'আবগারিরও তো ডিপার্টমেন্ট আছে। সেও মন্দ পুরস্কার নয়, অন্তত সাধনাশ্রমের থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তো।'

—'আমি ভাবছি আবার সাধনাশ্রমেই ঢুকব। এইবার বেদিতে উঠবে গিয়ে। সমাজের বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলছেন।'

—তুমি না শুনেছিলাম ম্যানেজারি নেবে?'

—'কই? না।'

—'পেলে না?'

—'তোমরা আমার সম্বন্ধে কত অভূতপূর্ব কথাই শোনো, সাহেবের সেক্রেটারি হবার জন্য তদবির করছি, মদ্রাজে চেষ্টা করছি। কলকাতার ইনসিওরেন্সে বড় চাকরি নিয়েছি।'

—'তোমার সম্বন্ধে কোনো গুজবে আমরা বিশ্বাস করি না মেজদা। সংসারের লোকেদের চিনি না না কি? মানুষকে ঈর্ষা করে তার সম্বন্ধে মিছিমিছি কত কুহ্ন রটিয়া বেড়ায়।'

—'অবিশ্যি যা পেনশন পাচ্ছি আমি, তাতে আমার চলে না। চাকরি একটা পেলে ভাল হয়। আমাকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু কাজে লাগালেন না। একজনকে নিলেন। ইনসিওরেন্সের মামাবাড়ির খবর জানি রে কিন্তু আমড়াগাছি করতে পারি না বলেই তো আজও পেলাম না। তা, এই পুজোর পর একটা পাবার আশা আছে। একটা বড় কোম্পানিতেই ৫০০ করে মাইনে দেবে।'

পিসিমা, একটু চুপ থেকে, 'হেমকেও একটা কিছু জুটিয়ে দাও না।'

-'ওর হবে ওর বাবার মত।'

—'কী রকম?'

—'থোড় বাড়ি খাড়া– খাড়া বাড়ি থোড়।'

—' তা তোমার একটু চেষ্টা করে—'

—'বেশ তো, ইনসিওরেন্সে একটি এজেন্সি নিক না; নেবে এজেন্সি?'

চুপ করে ছিলাম।

মেজকাকা—'কত ছেলে থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস অব্দি পড়ে ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তুমি এম-এ পাস করে নিতে ভয় পাও?'

—'ভয় না মেজকাকা।'

—'তবে? ধরো, বছরে ৫ লাখ টাকার কেস দেবে। আমরণ আওতার থাকবে।'

মা এসে পড়েছিলেন; বললেন, 'তাই তো; এই-ই কর না।'

লেগ পুলিং-এর মানে কী মা জানেন না, মেজকাকার এ পরামর্শের অর্থ কী করে বুঝবেন তিনি আর!

বললাম, 'শুনলাম, কর্পোরেশনের চিফের সঙ্গে তোমার [?আপনার] খুব আলাপ।'

মেজকাকা একটা ধমক দিয়ে—'আবার বাজে কথা বলে!'

—'কর্পোরেশনের একটা চাকরি জুটিয়ে দিন না।'

—'কর্পোরেশন আমাকে বলেছিলেন কয়েকটা বস্তি ইনস্পেক্টরি খালি আছে শুনেছিলাম। বিজয়ের প্রাইভেট মাস্টারটা না খেতে পেয়ে মরছে না কি, তারই জন্য একটা জুটিয়ে দেব ভাবছিলাম।'

—'বেশ তারই একটা দাও না আমাকে—'

—'হ্যাঁ, সে সব কাজ আর বসে থাকে কি না। কলকাতায় একটা চামার মরলেও দু শ গ্রাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে।'

—'কী করা যায় তা হলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোঁফে হাত বুলিয়ে 'ও-সব দুরাশা ছাড়ো। তবুও যদি জেল-ফেরৎ হতে, বলে-কয়ে কর্পোরেশনের একটা স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যেমন তুমি, তেমন তোমার বাবা, বায়ুভূত নিরালম্ব জীব। ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, আর কী, পরকালে কপাল খুলবে।'

কল্যাণী ভাবে কলকাতায় যেতে দেরি করে ফেলছি আমি। কিন্তু দেরি আর কী? দশ দিন আগে গেলেও যা, পিছে গেলেও তাই। কেউ আমার জন্য চাকরি হাতে করে বসে নেই। ফ্রি রিডিং রুমে রোজ গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে আসি। প্রায় পাঁচ-ছ খানা কাগজ পাওয়া যায়। নানা রকম চাকরি খালি রয়েছে বটে—রোজই খালি থাকবে, অ্যাকাউন্টট্যান্ট, কম্পাউন্ডার, নার্স, বাজার সরকার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, স্টেনোগ্রাফার, খানশামা, আয়া ইত্যাদি।

কলকাতায় গিয়েও কাগজপত্রে এই রকম দেখব।

আরো নানা জিনিস দেখেছি, নানা জায়গায় গিয়েছি, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু গত ছ-সাত বছরের মধ্যে এক-আধটা ট্যুইশান পেয়েছি। আর-কিছুই পাই নি। পাবই বা কী করে? আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্রিতা তো আমার নেই, না আছে বিরাট উদ্যমের অপরিমেয়তা।

মরিস বা অস্টিনের মত কোনোদিন আমি মোটর তৈরি করতে পারব? পড়তে পারব? প্রফুল্ল রায় বা নলিনী রঞ্জন সরকারের মত বেঙ্গল কেমিক্যাল কিংবা হিন্দুস্থান-এর মত গড়ে তুলতে পারব? পরিমল গোস্বামীর মত অক্সফোর্ড থেকে ফিরয় জুতো ব্রাশ করত পারব?

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুচ্ছেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধুলির শূন্যতায়। যে-উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটর কার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে [সেই] আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম নেই আমার।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয় স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা যদি থাকত তা হলে গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো-না-কোনো কাজ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম; হয় ত কোনো স্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি নিতাম, কোনো মেসের সরকার হয়ে যেতাম হয়ত, লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একদিনে হয় ত প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেলতে পরতাম, দর্জির কাজ শিখে ফেলতাম কিংবা স্টেনোগ্রাফার হয়ে যেতাম, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ক্যানভাস করতমা হয় ত, কিংবা প্রাণপণে শেয়ার বিক্রি করে চলতাম, হয় ত মুদির দোকানের মালিক হয়ে বসতাম, 'কিংবা দু-তিন গ্রুপে এম-এ নিয়ে ফেলতাম, হয় তনিদারুণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে জেলে পচতাম, কিংবা ভ্রূক্ষেপহীন অক্লান্তিতে পথে-পথে জুতো সেলাই করে চলতাম।

আলুর আড়ৎ না-খুলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বলে মনের ভিতর কোনো বেদনা থাকত না।

যদি আমি বিবাহ না করতাম, সন্তান না হত আমার, যদি একা থাকতাম আমি—তা হলেও শিল্পসৃষ্টি ভালবেসে, সংসারে বিফল হয়ে, মনের ভিতর কোনো নিরবচ্ছিন্ন বেদনা থাকত না। হয় ত খুব লঘুভাবে থাকত। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির ভার এমন একজনের উপর পড়েছে, যে, না-পারে ঐকান্তিকভাবে শেয়ার ক্যানভাস করে বেড়াতে, না-পারে ঘোলের-শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করবার বিন্দু মাত্র আগ্রহ দেখাতে।

সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন?

তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ—সুবিধা সুব্যবস্থা চায় বই কি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবয়বসম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমান-কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখান কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মত স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট। চণ্ডীদাস একজন, ভিলোঁ আর-একজন হাইনে একজন, আর-একজন ভারতচন্দ্র। শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন আরো অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের যক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি, কোনোদিনও পারবে না।

চারদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার। নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি আরম্ভ হল। বেশ লাগে আমার এই বৃষ্টি, খড়ের উপর সম-সম শব্দ হয়, ধুলোমাটির নরম সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, কেমন একটু শীত-শীত করে, সুগন্ধি কেয়া-কদমের মত দেহ কাঁটা দিয়ে উঠে। হৃদয় শিহরিত হয়ে ওঠে অবচেতনে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে-কাল মেয়েটিকে ভাববেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি—আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশ সেই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূর্ব আকাশে আকাশে ঘিরে তারই নিটোল কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দু'খানা হাত ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলোর সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।

সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ—সাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বহু দিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উঁইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিক আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝ পথে গেলে থেমে, তার পর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে শামুক-গুলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তার পর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর তাকে আর আমি দেখি নি।

অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে নীলাম্বরী শাড়ি পরে চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু'খানা হাত, ম্লান ঠোঁট শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।

খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।
ঘরের ভিতর বাবা এসে ঢুকেছেন।
—'খোকা।'
—'আমাকে ডাকছ বাবা?'
—'শুয়ে আছিস যে?'
—'এমনিই, তুমি কখন স্কুল থেকে এলে?'
—'অনেকক্ষণ'
—'সাড়াশব্দ পাই নি তো?'
—'বারান্দায় বসে ছেলেদের এক্সসাইজ খাতা দেখছিলাম। তোর মা কোথায়?'
—'রান্নাঘরেই তো—'
—'তা হবে; দেখলাম এক থালা লুচি ভেজে সুরেশকে দিল; বিকেলে তুই খাস নি?'
—'না। তুমি?'
—'আমি ঐ ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, একটু গুড় দিয়ে দিয়ে খেলাম। খাবি না কি?'
—'আছে আরো?'
—'ঢের আছে–'
বাবা ছোলা-গুড় আনবার জন্য উঠে যাচ্ছিলেন।
বাধা দিয়ে—'আচ্ছা আমিই নিয়ে আসব এখন, তুমি বসো।'
—'আচ্ছা বেশ'
একটু হাই তুলে, 'বৃষ্টি পড়ছে যে রে, টের পাসনি?'
—'হ্যাঁ পেয়েছি।'
—'তা হলে ঝাঁপি খুলে রেখেছিস কেন?'
—'কী আর হবে?'
—'জানলার জলের ছাট এসে টেবিলের বইগুলো ভিজে যাচ্ছে যে।'
—'যাক। এমন কী আর বই?'
—'কেন, কোনো ভাল বই নেই?'
মাথা নেড়ে—'না।'
বাবা বললেন—'খানিকটা খুচরো চা এনেছি।'
—'মেজকাকার জন্য?'
—'না, সুরেশ কি আর এই ছ-আনা পাউন্ডের চা খাবে'
—'ছ আনা বুঝি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ। চা খাবি? তা খাওয়াই ভাল, এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে ঠাণ্ডা লাগে, একটু গরম চা বেশ কাজ করে; সর্দি-কাশি নষ্ট হয়, মনের ভিতর একটু আশা-ভরসাও পাওয়া যায়। তোমার মাকে দিও, করে দেবে।'

—'তুমি খাবে না?'

—'চা খাওয়ার অভ্যেস নেই আমার।'

—'নেই অবিশ্যি, কিন্তু—'

—'খেলে ঘুম হবে না যে রে।'

চায়ের মোড়কটা জীর্ণ-বিবর্ণ সাদা খদ্দরের কোটের পকেটের থেকে বের করে বাবা টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন—'কলকাতায় যাবার টাকাটা জোগাড় করেছি। কবে যাবে?'

—'একদিন গেলেই হয়।'

—'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল।'

—'এই সাত বছর ধরে কত বারই তো এলাম-গেলাম, বাবা।'

—'কিন্তু এবার তো গত সাত বছরের মত হবে না।'

—'হবে না?' একটু হেসে, 'কী করে তুমি জানলে বাবা?'

—'আমার বিশ্বাস, তোমার মারও বিশ্বাস....'

একটু বিদ্রূপ করে হেসে বললাম, 'কী যেন বলছিলাম...'

বাবাকে আহত হতে দেখে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

—'তোমার মেজকাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল?

-'হ্যাঁ'

—'চাকরি-বাকরির কথা?'

—'হ্যাঁ, হয়েছিল।'

—'কী বললেন?'

'বললেন, তুমি আর তোমার বাবা ইহকালটা নমো-নমো করে কাটিয়ে দাও, পরকালে হয় ত কপাল খুলে যাবে।' দু-এক মুহূর্ত বাবা শ্রীহীন, জীর্ণ, ক্ষীণ মুখে বসে রইলেন।

তার পরেই হো-হো হেসে—'ও, তা এই বুঝি বললে সুরেশ?'

—'হ্যাঁ'

—'মন্দ বলে নি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।'

—'আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।'

-'পারলে না?'

—'মৃত্যুর পর কী আর থাকে?'

—'থাকে বই কি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের—'

-'উপনিষদ যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেন নি তো; রক্ত-মাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে—ধারণা তাদের ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাঁদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।'

-'এক দিন হয় ত দেখবে।'

—'আশীর্বাদ করো, দেখতে পারি যেন।'

—'নিজের মনের আন্তরিক অনুসন্ধানে যা সত্য বোধ হয় সেই টেকে। বিশ্বাস করো, এই আশীর্বাদ করি।'

—'তা হলে হয় ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।'

—'থাকো।'

—'ভাবতে গেলে তোমার দুঃখ করে না বাবা?'

—'কী দুঃখ? একে-একে যে দুই হয় এ-কথা যদি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, আমার বুদ্ধি-বিচার কলা সমস্তই যদি সাব্যস্ত করে যে তিন হয়—তা হলে এই অন্ধতার অভিশাপ বুকে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে; এ অভিশাপ মোচন করবার শক্তি আমার নেই। কোনো মানুষের নেই—বিধাতা যদি দয়া করে আলো দেন তবেই তা ঘুচতে পারে।' সাদা গোঁফ জোড়ায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বাবা বললেন—'কিন্তু এটা মনে করো না হেম, যে একে-একে তিন হয়, দুই হয় না। এই ভুল ধারণা নিয়ে তুমি জীবন চালাচ্ছ। হয় তো আমার এ ভগবানে বিশ্বাস, পরলোকে ঐকান্তিক আস্থা, সেই সব ভুল; জীবন-মৃত্যুতে আমি ধোঁয়ার ধাঁধা নিয়ে কাটালাম।' বলে সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবার।

বললেন 'যাক্ দু-তিন বছরের মধ্যেই বুঝতেই পারব সব।'

চোখ তুলে তাকালাম বাবার দিকে।

—'ভগবান ও শান্তির দিকেই যাচ্ছি, এই ভেবে মরব।'

—'কিন্তু এও তো হতে পারে মরে জেগে উঠব না আর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে পঁচিশ টাকার স্কুল মাস্টারি নিও না।'

—'কেন?'

—'হেডমাস্টার হয় ত সামান্য বি-এ পাস, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়াচ্ছেন, আর তোমাকে দেওয়া হবে ভূগোল আর অঙ্ক পড়াতে। এ সব অবিচার চোখ বুজে ক্ষমা করে দেবার মত কোনো প্রয়োজন দেখি না আমি।'

চুপ করে ছিলাম।

—'হ্যারিসন রোডের মেসে যদি থাকো তা হলে উল্টোডাঙ্গা, ঢাকুরিয়া বা চেৎলা-ফেৎলায় কোনো টিউশন নিতে যেও না।'

—'নেব না?'

—'না'

—'কেন?'

—'এ সম্বন্ধে আমার মতামত খুব ভাল করেই জানো। হয় তো কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা দেবে তোমাকে, কিংবা আরো কমই দেবে হয় ত, জীবনে টাকার মুখ তুমিও কম দেখেছ, সে ট্রেন ভাড়া দিতে গিয়ে তোমার অন্তঃকরণ খেঁকিয়ে উঠবে একেবারে। এ বড় দীনতার কথা, মানুষ এতে বড় খাটো হয়, বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে পায়ে হেঁটে যাবে সেই উল্টোডাঙ্গা পায়ে হেঁটে ফিরবে আবার; শরীরের দিক দিয়ে এর ভেতর যত না কষ্ট, আত্মার দিক দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশি অপচয়; কেন এ অপচয় করবে তুমি?'

একটু চুপ থেকে হেসে—'তা না-হলে কী করব?'

—'তা তুমি জান, আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিস করো না তুমি; বেদনা ও সঙ্কীর্ণতা এক জিনিস নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার; কী আর করবে? পনের টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না তুমি।'

হাসছিলাম।

বাবা বললেন—শকুন; কিন্তু বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে দশ টাকা-পনের টাকার টিউশন এর জন্য যারা চেতলা-উল্টোডাঙা পাড়ি দেয় তাদের দলে ভর্তি না হলে কলকাতায় যুদ্ধ যে আজকাল চলে না বাবা কি তা জানেন? দশ টাকা না হোক, বিশ টাকা পেলে?

বাবা বললেন—'কলকাতায় গিয়ে চা খাও না?'

—'খাই'

—'দোকান থেকে?'

—'হ্যাঁ'

—'বৌমার ঘরে একটা স্পিরিটের স্টোভ পড়ে আছে, খুকি হবার সময় কেনা হয়েছিল, সেইটে নিয়ে নেও।'

—'আচ্ছা'

—'এক বোতল স্পিরিট কিনে নেবে—খানিকটা খুচরো চা, নিজে তৈরি করে খাবে।'

—'তা খাওয়া যায়।'

—'আর খানিকটা বাতাসা, চার সঙ্গে। সন্ধ্যার দিকে কী করো?'

—'যদি টিউশন থাকে তো ছেলে পড়াতে যাই।'

—'আর যদি না—থাকে?'

—'তাহলে ফুটপাতে বেড়িয়ে-বেড়িয়ে, ওল্ড বুক শপের দু-চার খানা বই নেড়ে দেখি, এক-একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, আবার হাঁটি, চায়ের দোকানের খবরের কাগজ নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

—'বাঃ, এ সব কি মানুষের ভাল লাগে?'

—'না, আগে ভাল লাগত না একদম, কিন্তু কয়েক বছর ধরে তালিম হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু তবুও এ ত সত্যিকারের জীবন নয়।'

—'তা হয় ত নয়—আমার কি ইচ্ছে করে জানো?'

বাবা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম—'মস্ত বড় একটা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকি; পাশে মেঘনা কিংবা কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী। পেটের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না, দিন রাত লিখি আর পড়ি। দিগন্তবিস্তৃত সোনালি খড়ের মাঠের কিনারে বেড়াই, লাল আকাশ ভেঙে সন্ধ্যার দাঁড়কাকগুলোকে ঘরে ফিরে চলে যেতে দেখি।'

বাবা চুপ করে ছিলেন।

বললাম—'কিন্তু এ হয়ত শখ হল, পলায়ন হল, জীবন হল না। জীবন হয়ত ভিড়ের মধ্যে মিশে, যা করতে ইচ্ছা করে না, ভাবতে ভাল লাগে না, সেই অপ্রেমের কাজ ও চিন্তার জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের চেষ্টা।'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা এ-সব কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

বললেন—'কলকাতায় তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই?'

—'বছরের পর বছর ক্রমেই কমে যাচ্ছে।'

—'কেন?'

—'মতিগতির পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে হয় ত—'

—'বাবা একটু চুপ থেকে-'তারা হয় তো সাংসারিক সফলতা লাভ করছে।'

—'হ্যাঁ, কেউ করেছে, কেউ চেষ্টায় আছে।'

—'যাদের সঙ্গে থাকতে, কলেজে পড়তে, তারা আজ ট্রামে করে সেক্রেটারিয়েটে যায় আর তুমি ঘোরো ফুটপাতে?'

—'অনেকটা তাই'

—'অবিশ্যি এতে ব্যথা পাবারই তো কথা—'

—'না, সেক্রেটারিয়েট আর এমন-কী জিনিস, সেখানে ঢুকতে না পেরে খুব বঞ্চিত হলাম এ-কথা অবিশ্যি মনে করি না।'

—'নিজের মনকে হয় ত সান্ত্বনা দাও এই ভেবে যে এর চেয়ে কংগ্রেস ঢের বড় জিনিস। সেখানে সকলের অবাধ প্রবেশ; হয়ত কোনো এক ভবিষ্যতে সেখানে সে নেতা হয়ে বসবে।'

—'না অতদূর ভাবি না'

—'খানিকটা ভাবো নিশ্চয়ই; ভাবাই স্বাভাবিক। জীবনের আরাম ও বিলাসের জিনিসগুলো যাদের হাত থেকে ফসকে গেছে, অবশেষে তারা ত্যাগ ও মহিমার অকৃত্রিম ভক্ত হেয় ওঠে, না-হলে দাঁড়াবে কোথায়, বলো? ঐশ্বর্য যাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করে, ঐকান্তিক অশ্রু দিয়ে ত্যাগকে পূজা করবার শক্তি তার যেমন হয়, আর কারুর তেমন হয় না।'

—'কই, কংগ্রেসে আমি যাই নি তো!'

—'যাবার দরকার করে না তো; অনেক দিন থেকেই তোমার হৃদয়ে দেশপ্রেমের আসন পেতে রেখেছ হয় ত; সে আসন সব সময়ই চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু এক-এক সময় পড়ে, যখন কলেজের বন্ধু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে মোটর চালিয়ে ছুটছে আর তুমি পথের বেকার; যখন ছেলেবেলার খেলার সাথি তার মেমসাহেবকে নিয়ে বক্সে বসেছে আর তুমি চার আনার সিটে মাথা গুঁজে আছ।'

একটু চুপ থেকে—'দেশ, কংগ্রেস, দেশবন্ধু, বিরাট আত্মত্যাগ, অপরিমেয় স্বদেশ প্রেম—এই সবের কথা তখন মানুষের চিত্তকে সজীব করে গেলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন,—'পৃথিবীতে টিকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবার এই রকম সব বিধি ব্যবস্থা আছে। এ-সব না-থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড় ভয়াবহভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এ-সবের ঢের মূল্য আছে।' একটু চুপ থেকে বাবা—'বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে অবিশ্যি মানুষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় আর-এক ভাবে—জীবনের সঞ্চরিত পথ ও ভগবান কিংবা ভবিতব্যতা ও মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার আসে নি। এখনো দেশের মাটি, কংগ্রেস, কবিতা ও সাহিত্যের মর্যাদা, সাহিত্য স্বপ্ন, অবাস্তববাদ এই সব মোহকে আশ্রয় করেই ফুটপাতে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জোর পাচ্ছে।'

—'না, মৃত্যুর চিন্তাও মাঝে-মাঝে করি।'

—'করো?'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় বয়স চৌত্রিশ হয়েছে বটে—সত্তর হয় নি, কিন্তু তবুও সবই যেন সমাপ্ত হয়ে গেছে; কেমন একটা গভীর অবসাদ পেয়ে বসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেসের বিছানার থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না, মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, তখন ঘুমিয়ে পড়া যাক, অন্ধকার বেড়ে চলুক, কোনোদিনও যেন এই অন্ধকার শেষ হয় না, ঘুম কোনোদিনও ফুরোয় না যেন আর।'

—'আরো কী-রকম চিন্তা কারো?'

চুপ করে ছিলাম।

—'এই সৃষ্টিটাকে একটা পাখির খাঁচার মত তৈরি করে নিতে পারা যায়, তখন মানুষের অবস্থা বড় ভয়াবহ ওঠে। আমার অনেক সময় মনে হয় জীবনটা কলে ধরা ইঁদুরের মত। যেন চারিদিকে শিক আর শিকল শুধু—না আছে রূপ না আছে ফুর্তি—'

বাবা বিশেষ গ্রাহ্য না করে বললেন—'দুপুরবেলা কী করো? মেসে থাকো?'

—'আগে থাকতাম না, আগে বড় নির্বোধ ছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'মেসের বিছানায় একা-একা শুয়ে থাকতে বড় খারাপ লাগত।'

—'একা-একা?'

—'হ্যাঁ। সবাই অফিসে চলে যায়; অফিসারদের মেস, সকলেই কোথাও-না-কোথাও কাজ করে-জীবনের জবাবদিহি দেয়, জীবনের কাছ থেকে পুরস্কার পায়। এই সব অনেক দিন ভেবে-ভেবে বিছানায় আর শুয়ে থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি না আমি আর। মনে হত বেড়িয়ে আমিও হয় ত সৃষ্টির কাছে নিজের জীবনের কৈফিয়ৎ দেবার সুযোগ বের করে নিতে পারব।'

—'কিন্তু আজকাল বেরোও না বুঝি আর?'

—'নাঃ,' একটু হেসে বললাম, 'অবাক হয়ে ভাবি, জীবনের চার-পাঁচটা বছর ধরে সমস্তটা দুপুর কলকাতা শহরের কত জায়গায় টো-টো করে বেড়িয়েছি। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, ইঙ্গিওরেন্স অফিসগুলো। এক-একটা জায়গায় পনের-বিশ বার করেও গিয়েছি। নিজের জবাবদিহি দেবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এমনই প্রবল, এমনই রুচি তার যে সে মনে করে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের এক জন কেরানি হলেও জবাবদিহি দেওয়া হয়, কিন্তু দুটো কবিতার বই বের করলে হয় না। এই চার বছর যদি আমি এক মনে শিল্প সৃষ্টি করতাম, তা হলে অনেকগুলো মূল্যবান রচনা বের করতে পারতাম।'

—'যাক, চার বছর ঘুরেছ ভালই করেছ; না-যদি ঘুরতে তা হলে হয় ত মনে করতে কতকগুলো অসার কবিতা লিখে রাজত্ব তো নষ্ট করলাম, রাজকন্যাও গেল।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে বাবা বললেন—'আমাদের মন এই রকমই কেমন যেন রহস্যের জিনিস।'

একটু চুপ থেকে—'আজকাল দুপুরবেলা মেসে কী করো?'

—খবরের কাগজ পড়ি।

—'খবরের কাগজ আর-কতক্ষণ পড়া যায়?'

—'বোর্ডাররা প্রায় চার-পাঁচ খানা খবরের কাগজ রাখে।'

—'পড়বার ভার দিয়ে যায় তোমার উপর?'

—'পড়তে মন্দ লাগে না কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'

—'এই তো রচনার কথা বলছিলে, কিন্তু লেখোটেখো না কেন?'

—'লিখতে চেষ্টা করি মাঝে-মাঝে।'

—'তার পর?'

—'পেরে উঠি না—'

—'কেন? দুপুরবেলা মেস তো বেশ নিরিবিলি।'

—'কবিতা লেখার ওপর আগেকার সে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

—'কেন?'

—'মানুষের জীবন নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে স্থূল হয়ে পড়ে যেন—অবসাদ আসে, সমাপ্তির গন্ধ পাওয়া যায় যেন...।' একটু চুপ থেকে—'নবপর্যায়ের কবিতা লিখবার আগে এই স্থূলতা ও অবসাদটাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ করে এর [অংশ] হওয়া দরকার। তাই এই কাগজ পড়ে, যা হয়েছে যা হয় নি সেই কথা ভেবে-ভেবে, জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি।'

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

—'তা হলে নব পর্যায়ের কবিতা লিখবে তো?'

—'হ্যাঁ লিখব বই কি?'

—'হ্যাঁ, লিখো, একটা কিছুতেই বিশ্বাস রেখো,' বাবা বললেন, 'লাইব্রেরি থেকে বই এনে দুপুরবেলাটা পড়ো।'

—'আচ্ছা'

—'খবরের কাগজ বিশেষ পড়তে যেও না, এই রকম হতাশ পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনের আর দ্বিতীয়টি নেই।'

বললেন—'লাইব্রেরি থেকে কী বই এনে পড়বে, সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অধিকার আজ আমার নেই; যে-বই রুচিতে ধরে তাই পড়ো। কিন্তু লাইব্রেরিটা যেন উঁচু জাতের হয়, যেমনটি ধরো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি।' একটু চুপ থেকে—'এতদিন ধরে তুমি যা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছ, তোমার যা শক্তি ও বিচার আছে, তাতে এ-সব লাইব্রেরির থেকে বই এনে পড়বার অধিকার পেলে নিজের চিন্তা বা কল্পনার অপব্যবহার করবে না তুমি—এই আমি আশা করি,'—বলে উদ্ভাসিত মুখে আমার দিকে তাকালেন।

আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে তার পর বলতে লাগলেন—'আমাদের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসে একা ঘরে তুমি দুপুরবেলাটা কাটাবে—যাদের কোনো কাজকর্ম নেই, জীবনে কোনো নিকট সফলতা নেই হয় ত, যারা অনেক দিন ধরে সংসারের কাছে বিড়ম্বিত হয়ে আসছে, যাদের হৃদয় শেষ পর্যন্ত বাস্তবিক স্থূল নয় কিন্তু সত্যিই খুব কুণ্ঠিত, নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চিত করবার শক্তি যাদের ঢের কম, আত্মপীড়িত করবার শক্তি খুব বেশি—এই দুপুরবেলার সময়টা তাদের কাছে কত যে যন্ত্রণার জিনিস হতে পারে আমি তা খুব গভীর ভাবেই বুঝি।'

কিছুক্ষণ থেমে থেকে শেষে বললেন, 'কিন্তু তবুও কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতন করতে যেও না, তোমার চেয়ে অনেক কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিস দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি-মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে নিজের মনে স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না, উত্তেজিত হয়ে সময়ে—অসময়ে ফুটপাতে ঘুরে মরো না; কাজকর্মহীন লোকের পক্ষে কলকাতা থাকা একটা বিড়ম্বনা। ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে। নিজের শক্তি ও রুচির পরিমাপ খুব গভীরভাবে বিচার করে ঠিক করে নিও। নিজেকে যে-পথের উপযুক্ত মনে করো বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সেই পথেই চলো। জীবনের আশা, আশাভঙ্গ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরিণামের হিসেবে অবঞ্চিত থেকে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করে অগ্রসর হয়ো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাবাকে আমি বললাম—' দেখেছ বাবা, কী রকম বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'দেশের এই বর্ষাকে জীবনের সত্তর বছর বসেই তো দেখলে।'

—'দেখলাম।'

—'পাড়াগাঁয়ের এই বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষত এমনি রাতের বেলা।'

—'বেশ জিনিস।'

মনে-মনে ভাবলাম, এই রাত আর বর্ষা যদি চিরকাল থাকত। এই বাঁশের জঙ্গলের বাতাস, ঘরের পাশের লেবু পাতার থেকে ছুপ-ছুপ জলের শব্দ, মাঠে-মাঠে ব্যাঙের কোলাহল, জাম, তেঁতুল ও কাঁঠালের ঠাণ্ডা ডালপালার অবিরাম শব্দ, কোনো তিমিরচারিণীদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে প্রেতজীবনের প্রতিধ্বনির মত দু-তিনটি দাঁড়কাকের অবশ বিহ্বল কলরব।

—'তুমি শুয়ে পড়েছ বাবা?'

—'না'

—'কী করছ?'

—'না' একটু আলো জ্বালিয়ে পড়ছি।'

—'রাতের বেলা পড়ো না, তোমার তো ক্যাটারেক্ট।'

বাবা একটু হেসে, 'তেমন সিরিয়াস ক্যাটারেক্ট তো নয়। ভগবান শিগগির অন্ধ করবেন বলে মনে হয় না।' একট চুপ থেকে—'এই রাতের আলোতে চোখে তেমন খোঁচা লাগে না তো'। আরো খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'অবশ্য নীল চশমাটা পরেছি, চোখে বেশ আরাম লাগে।'

নীল চশমাটা অবিশ্যি সামান্য একটা এক টাকা দামের বাজারের জিনিস।

কয়েক মিনিট পরে বই বুজিয়ে, বাতি নিলিয়ে, বাবা-জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে—'আহা, অনেক বিরহের পর যেন এই মাঠঘাট, আম-কাঁঠালের জঙ্গল, এই করুণার সমুদ্রকে পেয়েছে।'

অঝোর শ্রাবণের দিকে তাকিয়ে জানলার পাশে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা। চিমসে রোগা চেহারা—জরাজীর্ণ চোয়াল, গাল, হাত-পা, ত্বক।

'জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে, ঠাণ্ডা লাগবে তো তোমার।'

বললেন—'জানলা বন্ধ করে দেব?'

—'আমিই দিচ্ছি।'

নিজেই বন্ধ করলেন।

চেয়ারে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, পরে ধীরে-ধীরে বললেন—'এত বুড়ো বয়সেও স্ত্রী যে আমার বেঁচে আছে, রোজগারের জন্য বিদেশে-বিদেশে ঘুরতে হয় না যে আমাকে, এমনি নিরিবিলি শান্ত শ্রাবণের রাতে দেশের বাড়িতে নিজের বিছানায় যে শুয়ে থাকতে পারি—অনেকবার আমার জীবনের এই সব সমস্যার কথা ভেবেছি আমি; কিন্তু তবুও যতটা শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া উচিত ছিল তা পাই নি।'

দু'জনেই চুপ করে ছিলাম।

—'দেশের বাড়িতে একাদিক্রমে সত্তর বছর কাটানো বড় কঠিন জিনিস,' একটু চুপ থেকে, 'যাক, কাটিয়ে দিয়েছি।'

বললেন—'তোমার মাও কাটিয়ে দিয়েছেন বিধাতা যদি এসে বলেন। জীবনের পুনরভিনয় করতে, বলি না, থাক, এখন ভবিষ্যতে আমাদের জন্য যা সঞ্চিত আছে তাই দাও।'

তেঁতুল গাছের ডালপালার ভিতর কয়েকটা বক বকবক করে ডেকে উঠল। বাবা বললেন—'তোমার মা এখনো আসেন নি?'

—'না,

—'রান্নাঘরে আছেন?'

—'দক্ষিণের ঘরে মেজকাকার সঙ্গে গল্প করছেন বোধ করি'

—'বৌমা কোথায়?'

—'খুকিকে নিয়ে ঘুমিয়েছেন দেখে এসেছি।'

—'তোমার ঘর আজ যে বড় অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে, আলো জ্বালো নি যে?'

—'জ্বালি নি, এমনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রোজই তো আলো জ্বেলে পড়াশোনা করো।'

—'আলোটা মেজকাকার জন্য নিয়ে গেছেন।'

—'কে?'

—'পিসিমা।'

—'কেন?'

—'মেজকাকার ও-ঘরের আলোর চিমনি ফেটে গেছে।'

—'ওঃ, তা হলে আমাকে আগে বলো নি কেন?'

—'আলোর দরকার বোধ করি নি আজ আর।'

—'লাগলে আমার দেরাজ থেকে মোমবাতি নিয়ে এসো।'

—'তা আনব।'

—'তোমার এদিকের জানলা খুলে রেখেছ দেখছি—'

—'দেখো, কেমন লেবু গাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'এমনি পাড়াগাঁর এই সব রাত তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?'

মনে-মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস! জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারা জীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই—বেঁচে থেকে, বিছানায় শুয়ে গড়িয়ে, উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি—কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম—'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-কাঁঠাল-লেবুর বন, জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

—'তা আমি বুঝি—'

বাবা—'এখনই-বা কলকাতা যাবার এত কী তাড়া তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'কিছুকাল থাকো এখানে, ভাদ্রমাসে যেও, কিংবা পুজোর পরে।'

মাথা নেড়ে 'না-অনেক দিন দেশে থাকলাম তো। কল্যাণীকে বলেছিলাম চার-পাঁচ দিন থাকব, প্রায় পাঁচ মাস কাবার করে দিলাম। এখন তার মুখের দিকে তাকাতেই ভয় করে। বেচারি আমার ভালর জন্যই আমার উপর রাগ করে।'

—'ভাবে যে কোনোরকমে তোমাকে কলকাতায় পাঠালেই হল?'

—'হ্যাঁ। তার পর চাকরি আমাকে খুঁজে নেবেই।'

—'বহু দিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'

—'না তো'

—'আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু—আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মত মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।'

একটু চুপ থেকে—'আর বনলতা?' আমার দিকে তাকিয়ে, 'মনে হয় তার কথা তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'না। ভুলেই গেছ হয় ত।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বললেন, 'কিন্তু'—। কিন্তু এই বলেই চুপ করলেন—কথাটা বাবা আর শেষ করলেন না।

বললেন—'খুকি দুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল?'

—'কী জানি?'

—'ওর মার আবার এদিকে দৃষ্টি নেই একটুও।'

—'দুধ না-খেলে কেঁদেই উঠবে।'

—'সে তো অনেক রাতে।'

—'মেয়ে কাঁদলে ওর মা বড্ড বিরক্ত হয়—মাঝে-মাঝে পাখার ডাট দিয়েও মারে। আমিই গিয়ে দুধ খাইয়ে আসব।'

—'অত রাতে গরম করে খাওয়াবে তো?'

—'হ্যাঁ, তা বইকি, দুধ গরম করে নিতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাই কারো; স্পিরিট ফুরিয়ে যায় নি?'

—'গেলে, কাগজ জ্বালিয়ে নেব।'

—'কেমন; গায়ে লাগে না যেন কিছু মেয়েটার; কেমন চিমটে বিড়ালের মত চেহারা; মনে হয় যেন একটা শুকনো পাতা হাঁটছে, বাতাসের এক ফুঁয়ে যাবে উড়ে; আড়াই বছর বয়স হল, অথচ দেখে মনে হয় যেন এক বছরও পেরয় নি। খেতে পায়? না, খেতে পায় না? না কিছু গুরুতর অদৃশ্য অসুখ? তুমি বললে—রাতে মাঝে-মাঝে টেম্পারেচার রাইজ করে?'

—'হ্যাঁ'

—'তা, কালমেঘটা খাওয়াচ্ছ?'

—'খাচ্ছে।'

—'তুমিই খাইয়ে দিও, বৌমার উপর নির্ভর করো না, তা হলে হয় ত গাফিলতি হবে।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে—'মথুর ডাক্তার বললেন খাওয়াতে, আমি এনেছি একটা—'

—'আনলে বুঝি?'

—'স্কুল থেকে ফেরবার সময় নিয়ে এলাম, কালমেঘটা ফুরুলে দিও এটা।'

—'আচ্ছা'

—'বৌমা সন্ধ্যের থেকে ঘুমুচ্ছে? খেয়েছিল?'

—'বিকেলে খেয়েছে।'

—'কী খেল?

—'জলের মধ্যে খানিকটা তেঁতুল গুড় গুলে, দু-তিন হাতা পান্তা।'

বলে হাসতে লাগলাম।

—'এই শুধু? আর-কিছু না?'

—'না'

—'রোজ এই রকমই করে,'

—'হ্যাঁ এই রকম।'

বাবা গম্ভীর মুখে—'অসুখ করেছে না কি?'

—'না'

—'তবে?'

—'এই রকমই ওর রুচি কিংবা আমার উপর হয় ত মান।' বাবা একটু চুপ থেকে—'বাঁচবার ইচ্ছে নেই?'

'কী জানি।'

দু-চার দিন কেটে গেছে—কিন্তু তবুও কলকাতায় যাওয়ার কোনো চাড় নেই। কল্যাণী তেঁতুলের জল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে দু-চারটে মরিচ পুড়িয়ে নেয়, কোনোদিন উপবাস দেয়। কিন্তু তবুও এই সুখ ছেড়ে সহসা যাওয়া হয়ে ওঠে না। খুকি দুপুররাতে রোজ কেঁদে ওঠে।

মা, বাবা, কল্যাণী কেউই কোনো সাড়া শব্দ করে না। তার পর কান্না বাড়তে থাকে, পাখার ডাঁট দিয়ে পিটুনি শুরু হয়—তবুও নড়তে ইচ্ছা করে না বড় একটা।

বাবা বললেন—'খোকা, জেগে আছিস?'

—'আছি'

—'খুকি কাঁদছে—'

—'শুনেছি।'

—'মার খাচ্ছে মেয়েটা, আহা-হা, আহা-হা।'

পাখার আরো কয়েক ঘা পড়ে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে গিয়ে—'তুমি যে একেবারে অমানুষ হয়ে গেলে, কল্যাণী।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠে—'আমি পরের মেয়ে, আমাকে গাল দিও না বলে রাখছি।'

খুকি থেমে যায়।

আমাকে দেখে বিছানার উপর উঠে বসে। আমি বলি, 'বোস, দুধ গরম করেছি।'

কল্যাণী—'রাত দুপুরে বড় বাপ-মা তুলে গাল! অমানুষ! তোমাদের ঐ ঘরে মানুষ কটা শুনি? ফের গাল দিয়েছ তো তোমার মেয়ের গলা টিপে আমি জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

পাশের ঘরে থেকে মা 'ছি ছি' করতে থাকেন; হয় ত কেঁদে ওঠেন, কিংবা নানা রকম কথা বলেন বধূমাতাকে।

বাবা বলেন—'তোমাদের সকলের মাথা খারাপ হল না কি?'

ঘরের মধ্যে শোরগোল—বিষ, ঝাল, মৃদু গুঞ্জন, নালিশ, ফোঁপানি, অশ্রু, অভিমানের জের অনেকক্ষণ চলতে থাকে।

খুকি খাটের এক কিনারে পা ঝুলিয়ে পাথরের মত চুপচাপ বসে থাকে; বয়স আড়াই বছর, দেখায়, এক বছরের মত; বিচার-কল্পনার শক্তি হয় ত চল্লিশ বছরের গৃহিণীর মত; জীবনের আস্বাদ সত্তর বছরের মানুষের মত; এর ভবিষ্যৎ কী, আমি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজ জ্বালাবার দরকার হয় না, বাবা স্পিরিটের বোতল কিনে এনে দিয়েছেন! অসতর্কতায় অনেক স্পিরিট মাটিতে পড়ে যায়, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে স্পিরিট ঢেলে দেই, কাঠ ঘসে আগুন জ্বালাই, দুধ গরম করি, খুকি অবাক হয়ে একবার আগুনের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশি গরম করবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তবুও মনের ভুলে অনেক গরম হয়ে যায়, উপযুক্ত মতন ঠাণ্ডা করে নিতে সময় লাগে, মেয়েটি যাদুমন্ত্রে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসে থাকেঃ বেত ফলের মত চোখ দু'টো প্যাট-প্যাট করতে থাকে; হাত-পা, মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাস প্রতীক্ষা করছে। এ সংসারের নানা রকম সমস্যার কারণ যে সে, তা সে খুব ভাল করেই বুঝতে পারে।

দুধের বোতলের প্রয়োজন হয় না, ঝিনুকের দরকার নেই, বাটি সেই নিজের হাতে তুলে নেয়, কিন্তু অসাড় দুর্বল হাত এই সামান্য বোঝাটুকুতেই কাঁপতে থাকে।

বাটিটা আমি ধরি—ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খায় সে। ধুতির খুট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেই তার।

একটু জল চায়—এনে দেই।

দেখি, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে। ধীরে-ধীরে মুছিয়ে দেই। তার পর, আমার সঙ্গে আমার বিছানায় চলে আসে সে।

মশারি তুলে ফেলি, পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকি, এতক্ষণে, আরামে, রুগ্ন অবিশ্বাসী মুখে, খানিকটা ভরসা আসে তার। কৃতজ্ঞতার আলোকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে; তার পর একটু হাসে।

হাসি মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যায়, চোখ কেমন অসাড় ব্যথিত হয়ে আসে। বুঝি, বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে সে। হাত বুলিয়ে দেখি হ্যাঁ, ভিজিয়েই দিয়েছে সে অনেকখানি জায়গা। বলি—'বেশ করেছ, ভয় পাচ্ছিস কেন?'

কিন্তু তবুও মুখ-চোখের বিবর্ণতা কাটে না।

—'বিছানা ভিজিয়ে দিলে মা তোমাকে মারে?'

কোনো উত্তর দেয় না।

—'পাখার ডাঁট দিয়ে পেটায়?'

নিশ্চুপ, নিঃসার; সলতের মত হাত দু'খানা তুলে নেই, সমস্ত গায়ে-পিঠে হাত বুলাই, মিঠাইয়ের দোকানের খানিকটা বাসি পরিত্যক্ত ময়দার মত যেন, কারা যেন পিষতে-পিষতে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। হাত-পা-আঙুল কালিয়ে গেছে; কপাল-চুল ঘামে ভিজে গিয়েছে। দাঁড়কাকের ঘাড়ের ভিজে রোমের মত কতকগুলো কাল পাতলা চুল।

ভিজে ইজেরটা খুলে ফেলে দি। বলি—'খুকি, মারব তোমাকে?'

চুপ করে থাকে।

—'পাখা দিয়ে লাগাই এক ঘা?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করে।

-'তবে আমার বিছানা ভিজিয়ে দিলে কেন? মারি?' পাখার ডাঁট তুলে ধরি। শিশুর হৃদয়ে কোনো ভাব খেলা করে বিদীর্ণ মুখে বড় একটা ফুটে ওঠে না। পাখার ডাঁটের দিকে একবার তাকায়, আমার মুখের দিকে একবার তাকায়, কপাল ও ভুরুর সরলতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, ঠোঁট নড়ে, বেত ফলের মত চোখ তুলে চালের বাতার দিকে নিগূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—'মার কাছে নিয়ে যাব?'

সহসা কোনো উত্তর দেয় না।

—'মার কাছে যাবি?'

—'না।'

—'এইখানে থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে একটু সরে শোও।'

খানিকটা সরে যায়।

—'বালিশ লাগবে না?'

মাথা নেড়ে 'না' বলে।'

—'ভিজের উপর শুলি যে—'

কিন্তু ভিজে জায়গায় শুতে কোনো আপত্তি নেই বেচারির, কোনো রকমে শান্তিতে, নিস্তব্ধতায় রাতটা কাটিয়ে দিতে চায় হয় তো, হয় তো ভবিষ্যতে জীবনটাও এই রকম ভাবেই কাটাতে চাইবে সে, ভবিষ্যৎও কী যে নিগূঢ়?

একে পৃথিবীতে আনবার জবাবদিহি কাকে বহন করতে হবে—আমাকে না বিধাতাকে?

হ্যাঁ, বেছে ভিজে জায়গাটায় গিয়ে শুয়েছে, হয় তো নিজের কৃতকার্যের ফল নিজেই বহন করতে চাইছে; হয় তো আমাকে অযথা অসুবিধায় ফেলবার কোনো ইচ্ছে নেই, হয় তো এই রকম ভয় ও দীনতাই এর রক্ত-মাংসে দিয়েছেন বিধাতাও, হয় তো...

'বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি? ওঠ তো—'

বলা মাত্র বিনা দ্বিধায় উঠে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁজাকোলা করে ধরে তাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেই। ভিজে চাদরটা মুড়ে তুলে নিয়ে, তোশকটা উল্টে দিলাম। তার পর আলনার থেকে আমার গায়ের খদ্দরের চাদরটা এনে পাতি।

শোলার পুতুলের মত অন্ধকারের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, আবার তুলে উঠিয়ে দিলাম। বললাম, 'কেমন রে এখন শুতে বেশ আরাম, না?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ'

তেমন বিশেষ কোনো সজীবতা নেই মুখে।

কেমন কাতরভাবে পা চুলকুচ্ছিল।

—'পায়ে হল কী তোর?'

—'পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে কোত্থেকে এল আবার?'

—'মাটিতে।'

দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলাম কতকগুলো বিষ-পিঁপড়ে বেচারির গায়ের নানা জায়গায় কামড়াচ্ছে।

—'এত কামড় খেলি? তবুও আগে বলতে পারলি না? কামড়ে যে লাল করে দিয়েছে রে?'

—বাবা বললেন, 'কীসে কামড়েছে রে খোকা?'

—'কিছু নয়, পিঁপড়ে।'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয় তো?'

পিঁপড়ে ছাড়াতে-ছাড়াতে—'না।'

মা—'মাকড়সা নয় তো রে, মাকড়সা?'

—'না, গো না।'

—'দেখিল ভাল করে, মাকড়সার কামড়ে বড্ড বিষ।'

তাকিয়ে দেখি, কল্যাণী নিঃশব্দে বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের। চোখের নিদ্রালুতা হঠাৎ যেন গেছে কেটে, খানিকটা ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে—'কী হল আবার?'

—'বসো'

—'খুকির কিছু হয়েছে না কি?'

—'এই পিঁপড়ের কামড় খেয়েছে আর কী?'

-'ঠিক দেখেছ তো, পিঁপড়ে?'

—'হ্যাঁ'

—'পিঁপড়ে? আর-কিছু নয়?'

—'না'

—'কই? দেখি—?'

দেশলাইটা জ্বেলে আবার দেখলাম।

—'এঃ লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ পড়ে গেছে যে একেবারে।'

—'নরম মাংস কি না।'

গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে—'এ যে অনেক কামড়। কোত্থেকে কামড়াল? আঃ তোমার দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল দেখছি।'

আবার জ্বালালাম।

—'এ পিঁপড়ে? না বিছে?'

—'না, বিছে নয়—'

—'ভাল করে দেখেছ তো? বর্ষাকালে কত কী যে থাকে, আহা বেচারি, কিসে কামড়েছে তোমাকে মা?'

—'তা, ওকে তুমি নিয়ে যাও তা হলে এখন—'

—'কেন দু-দণ্ড রাখতে নিয়ে এতই অসহ্য হয়ে উঠল?'

'না, তা নয়—'

—'তা বই-কি! তুমি মনে করো, মেয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।' দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল।

—'নিভিয়ে দিলে?'

—'না, নেভাই নি—'

—'তবে?'

—'এমনি গেল নিভে।'

—'বাতাসে?'

—'না, ছোট্ট একটা কাঠি কতক্ষণ আর জ্বলবে?'

—'মশারি গুটিয়ে রেখেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বড্ড গরম।'

—'তাই বলে মশারি গুটাতে হয়, খোলা বিছানা পেয়ে রাজ্যের যত পোকা-মাকড় এসে ঢুকবে।'

মশারি সে ফেলে দিতে গেল।

—'আমিই ঠিক করে নেব, কল্যাণী।'

—'তোমার লণ্ঠন কোথায়? নিভিয়ে ফেলেছ?'

—'না—'

—'ঘরে লণ্ঠন রাখো না কেন তা হলে?'

—'বাবার দেরাজে মোম আছে, নিয়ে এসো না লক্ষ্মীটি।'

—'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। পা নাড়তে ইচ্ছা করে না আর—সত্যি বলছি।'

বিছানার এক কিনারে পাথরের মত বসে রইল কল্যাণী।

—'তা হলে তোমার ঘরের লণ্ঠনটা দিয়ে যাও।'

—'আর, আমি অন্ধকার ঘরে থাকব? আমার বেলায় এই রকমই তোমার ব্যবস্থা।'

বিছানার আর-এক প্রান্ত বসে চুপ করে ছিলাম।

কল্যাণী—'তা কি আমি আজ থেকে জানি? অনেক দিন থেকেই জানি। এ রকম জানলে—'

মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল সে।

আমি চুপ করে বসে ছিলাম। চটি জুতোর শব্দে চমক ভাঙল।

তাকিয়ে দেখি বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতির খুট গায়ে, খুটের ভিতর থেকে একটা মোম বের করে বললেন, 'এই নাও। খুকি কি ঘুমিয়েছে?'

—'ঘুমুচ্ছে বোধ করি।'

—'হ্যাঁ, ঘুমোক মশারিটা ফেলে দিও। ফেলবার আগে মোম জ্বালিয়ে ভাল করে বিছানাটা একবার দেখে নিও।'

কল্যাণীর পিঠে আস্তে-আস্তে দু-তিন বার হাত বুলিয়ে চলে গেলেন তিনি। কল্যাণী চাপা গলায়—'এ কী ভয়ানক অন্যায় তোমার বাবার।'

—'কী রকম?'

—'আমি এখানে আছি। অথচ তিনি এ ঘরে ঢুকলেন।'

—'সহজভাবেই ঢুকিছেন।'

কল্যাণী মাথা নেড়ে—'আমার নিজের বাবা হলে এ-রকম অবস্থায় কিছুতেই ঢুকতেন না।'

—'খুকিকে বড্ড ভালবাসেন কি—না বাবা।'

—'তা হোক—তাই বলে এত রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর ঘরে একজন পুরুষমানুষ হয়ে ঢুকবেন তিনি?'

কল্যাণী চোখ কপালে তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

—'সত্তর বছরের বুড়ো মানুষের পক্ষে এ জিনিস এমন কিছু অশোভন নয়।'

—'তুমি তাই মনে করো! রুচি-শোভনতার এর চেয়ে ভাল নমুনা তো কোনোদিন দাও নি।

—'ছি, আস্তে। শুনলে কী মনে করবেন তাঁরা!'

—'আমার বাবা হলে—হোক না মেয়ে-জামাই, তাদের ঘরের ত্রিসীমানায়ও আসত না এত রাত্রে।'

একটু চুপ থেকে, 'আমার বাপের বাড়ির রুচি-সংযম তোমার সে-সবের কল্পনাই বা করবে কী করে। অবাক হয়ে ভাবি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি।'

বাবা তার বিছানার থেকে গলা খাঁকরে—'আমার হনে হয় তোমার ঘরে বাতাসা কিংবা গুড়ের টুকরো পড়ে ছিল হেম।'

—'তা হবে।'

—'হ্যাঁ, তার গন্ধে—গন্ধে বিষ-পিঁপড়ে এসে জমেছে।'

—'তাই মনে হয়।'

মা বললেন—'বর্ষাকালে অনেক সময় পোকা-ফড়িং মরে থাকে, দেখিস নি খোকা?'

—'হ্যাঁ, দেখেছি।'

—'সেই জন্য এত পিঁপড়ে হয়।'

—'তা ঠিক। কাল ঘরটা ভাল করে ঝাড় দিয়ে ফেলতে হবে।'

—'হ্যাঁ খুব ভাল করে।'

বাবা—'ও, ঐ যে বাতি নিয়ে পড়ি না আমরা রাত্রে, তখন লণ্ঠনের চার পাশে অনেক পোকা মরে থাকে, সেইজন্যই এত পিঁপড়ে জমে বুঝি?'

মা—হ্যাঁ, বিশেষত এই বর্ষার সময় অন্য কোথাও খাবার পায় না কি-না।'

দু'জনেই বিস্তব্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণী হাই তুলে—'বাবা, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ঘুমে। সাপে খেল, না ব্যাঙে খেল দেখতে এলাম। অলক্ষুণে মেয়ে, ওকে কারা কাটবে? সারাটা জীবন মানুষের হাড় চিবিয়ে কে খাবে তবে আর?'

ঘুমের চোখে বিড় বিড় করতে-করতে চলে গেলে কল্যাণী। মিনিট তিন চারের মধ্যে সব চুপচাপ।

বিছানায় খুকির পাশে শুয়ে বললাম—'ব্যথা না কি রে?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

পিঠের কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

—'চুলকে দেব?'

মাথা নেড়ে—'চুককে দাও।'

আস্তে-আস্তে হাত বুলাতে লাগলাম।

—'কিসে কামড়েছে তোমাকে খুকু?'

—'পিঁপড়ে'

—'কেন কামড়াল?'

মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তর দেবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু বাক্য জুগিয়ে ওঠে না।

'পিঁপড়ে কোথায় আছে খুকু?'

—'মাটিতে।'

—'সেখানে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

এক পা তুলে চুলকুতে-চুলকুতে বিজ্ঞ মুখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'তোমার নাম কী?'

—'কুকুলানি'

—'রাণীও আবার?' চোখ দিয়ে বিরস ব্যথিত মন্তব্য কেটে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

—'কে রেখেছে নাম?'

—'দাদু'

—'লানি নয়, রাণী'

—'লানি'

—'নারে, রাণী'

—'লানি'

ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন রাত্রে ঝড়-জল, ভয়ানক।

বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে, রাত দশটার সময় বাবা এসে বললেন—

'খেয়েছিস খোকা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার মেজকাকা খেয়েছেন?'

—'খেয়েছেন।'

—'তার খাবার সময় আমি যেতে পারি নি। খাতা দেখছিলাম। ঢের খাতা, কাল হয় ত ইনস্পেকশন হবে স্কুলে।'

—'ইনস্পেকটর আসবেন বুঝি?'

—'আসবার তো কথা; সন্ধ্যার থেকেই ছেলেদের খাতা-পত্র নিয়ে বিব্রত ছিলাম তাই।'

একটু চপ থেকে-'যা দুর্যোগ আজ! স্কুলের থেকে এসে দক্ষিণের ঘরে আর যেতে পারি নি তাই। তা তুমি তোমার মেজকাকার খাবার সময় ঘরে ছিলে তো?'

—'হ্যাঁ'

—'তত্ত্বাবধান করেছিলে?'

—'করেছিলাম। পিসিমা আসেন, আমার না-থাকলেও চলে।'

—'তবুও থেকো—।'

—'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

—'তিনি তো ঘরে বসেই খেলেন?'

—'হ্যাঁ ঘরেই খান—'

—'টেবিলে?'

—'হ্যাঁ—'

—'কে এনে দিল?'

—'মা।'

—'কী খেলেন?'

—'নিরামিষ।'

জীবনানন্দ উপন্যাস সমগ্র ~ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মেজকাকা আজ খিচুড়ি খেতে চেয়ে ছিলেন।'

—'হ্যাঁ, এমনি বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে খিচুড়িই তো খায় মানুষে।'

—'তুমি কী খেলে?'

—'আমি দুটো ভাতই খেলাম।'

—'কী দিয়ে?'

—'এই পুঁই চচ্চড়ি না কী করেছিল আর কাঁচা মুগের ডাল।'

—'রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এলে?'

—'হ্যাঁ, ছাতা আছে; ব্যাস। এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তোমার মা কত দিক টানবেন? সুরেশকে খিচুড়ির সাথে ঘি দিয়েছিল তো?'

—'হ্যাঁ, মার সে-সব ঠিক আছে।'

—'আর, আলু ভাজা বুঝি?'

—'ইলিশ মাছ ভাজা'

—'বেশ গরম-গরম ছিল তো?'

—'খাবার সময় ভেজে দেওয়া হয়েছে, পিসিমার স্টোভে।'

—'বেশ, তা সুরেশ খানিকটা খেতে পারল তো? আমাদের সংসারের রান্না চল্লিশ বছর ধরে সে বড় একটা খায় না—কী দিয়ে রান্না হয় কলকাতায়, পাকা মুসলমান বাবুর্চি রান্না করে দেয়—তাই বড় সঙ্কোচ হয় তাকে খাওয়াতে।'

—'ও, ছোটকাকা প্রায় ছোট এক ডেকচি আন্দাজ খিচুড়ি খেয়ে ফেলেছেন।'

—'খেলেন?'

—'হ্যাঁ। খুব তৃপ্তির সঙ্গে, ইলিশ মাছ ভাজা, ফুল ভাজা, ডিমের ওমলেট, পেপের টক, ছানার পায়েস।'

বাবা একটু হেসে—'যাক্, আজকের রাতের যজ্ঞ শেষ হয়েছে তাহলে তোমার মার।'

—'হ্যাঁ'

—'সুরেশের হজম হয় তো?'

—'হজমের জন্য মেজকাকার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।'

—'কী?'

একটু চুপ থেকে, 'খাওয়ার পর কী যেন খান।'

—'আহা, তা সোডা ওয়াটার এনে দিলেই হত সুরেশকে।'

—'আমি বলেছিলাম, সোডা ওয়াটারের কথা, মেজকাকার বিশ্বাস, কলকাতা ছাড়া আর-কোথাও ভাল সোডা ওয়াটার পাওয়া যায় না।'

বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—'বৌমা আজও কি সন্ধ্যোর থেকে ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ'

—'খেয়েছে তো?'

—'বিকেলেই খেয়েছে—'

—'কী যেন?'

—'পান্তা ভাত, মরিচ পোড়া, আর সেই তেঁতুল গুড়ের ঝোল।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে, 'বৌ কি আমার চোখের সামনে হত্যা দিয়ে মরতে চায়?'

—'না মরবে না।'

—'মরবে না? এই খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? আমার কী যে কষ্ট হয় হেম।'

—'মানুষের প্রাণ ঢের শক্ত। কলকাতায় কত লোক ফুটপাতের এঁটো কুড়িয়ে খায়।'

—'কিন্তু তাদের যে বাঁচবার আগ্রহ। তারই জোরে বেঁচে থাকে ওরা। এই মেয়েটি যে'—বাবা বললেন—'তোমাকে ভালবাসে না?'

—'জীবনের প্রতিই কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে যেন।'

—'তুমিও বীতশ্রদ্ধ হয়েছ না কি?'

—'জীবনের ওপর?'

—'বৌ-এর ওপর?'

—'নাঃ, বড় কষ্ট হয় ওর জন্য আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন—'দেখো, কলকাতায় গিয়ে কোনো রকম একটা চাকরি জোগাড় করতে পারো না কি। না-হলে এই নারীটিকে বাঁচানো বড্ড শক্ত হবে।'

একটু চুপ করে থেকে—'খুকিকে আজ ন-টার সময় দুধ খাইয়ে দিয়েছি।'

—'এখন শোবে?'

—'কে আমি? হ্যাঁ, এই শুয়ে পড়ি আর-কী—'

—'কিছু পড়বে-টড়বে না বুঝি আর?'

—'নাঃ, আর পড়ে কী হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা, খুকিকে তোমার কাছে নিয়েই শোও। ওর মাকে একটু সুস্থিরে ঘুমোতে দাও।'
—'যাই, নিয়ে আসি।'
—'তোমার মা কোথায়?'
—'দক্ষিণের ঘরে।'
—'কী করছেন?'
—'মেজকাকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।'
—'খেয়েছেন?'
—'বোধ করি খেয়েছেন—'
—'ফিরবেনই-বা কখন?'
—'এই বারটা সাড়ে-বারটা—'
—'কেন? এত রাত হবে কেন?'
—'মেজকাকা অনেক রাত অবধি গল্প করতে ভালবাসেন।'
—'তা পিসিমাই তো আছে।'
—'মাকেও চাই।'

কল্যাণী—'কে?'
—'তুমি জেগে আছো?'
—'বাপরে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—'
আমার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে, 'না-বলে-কয়ে অন্ধকারের মধ্যে, এই রকম ঢুকতে হয় না কি?'
—'ভেবেছিলাম তুমি ঘুমুচ্ছ—'
—'ঘুমুচ্ছিলামই তো—'
—'এসে তো দেখছি চোখ চেয়ে জেগে রয়েছ—'
—'তোমার পায়ের শব্দে তো জেগে গেলাম।'
—'আচ্ছা, এর পর পা টিপে-টিপে আসব।'
—'না, ঘরে বাতি নিভে গেলে তুমি আর আসতে পারবে না।'
—'সন্ধ্যের থেকেই তো বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকো।'
—'এই আমার খুশি, তুমি এসো না।'
—'সারা রাত এত ঘুমুতে কষ্ট হয় না?'
—'বকবক করো না, কাজে যাও এখন—'
—'কী খেয়েছিলে আজ?'
বালিশে মুখ গুঁজে দাঁত কপাটি হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। দেখলাম, কাঁদছে।
—'একী, কী হল তোমার আবার?'
—'থাক, আমার খোঁজ নিয়ে দরকার নেই।'
বিছানার পাশে বসতেই, কেঁদে ফুলতে-ফুলতে—'তুমি ওঠো'
—'একেবারে ঘামিয়ে গেছ যে—'
—'তবুও কথা বলবে? কথা বলতে বলি নি তোমাকে—'
—'সন্ধ্যার থেকেই কি জেগে আছ?'
—'আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দেবে?'
—'কেন মেজকাকারা তো দক্ষিণের ঘরে খুব হৈ-চৈ করছেন, শুনছ না?'
—'করুক। তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'
—'কই, মেজকাকার খাওয়ার পাশে একদিনও তো তুমি দাঁড়ালে না, কল্যাণী।'
—'আমার দাঁড়ানোর কী প্রয়োজন?'
—'তিনি বললেন বৌমাকে তো বড় একটা দেখা যায় না।'
—'আচ্ছা', ঠোঁট উল্টে কল্যাণী—'হয়েছে।'
—'আমি বলেছি, তপস্যা না করলে বৌমাকে দেখা যায় না।'
—'তোমার পায়ে পড়ি, কথা শুনতে ভাল লাগে না এখন আমার।'
—'আচ্ছা, কথা কইব না আর।'
—'বসে রইলে যে?'
—'চুপচাপই তো বসেছিলাম। তুমি কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'
—'তুমি এখন যাও।'
—'কোথায়?'
—'তোমার ঘরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গিয়ে কী করব?'

—'যা খুশি তাই করে , তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।'

ধীরে-ধীরে তার কপাল থেকে হাত খানা সরিয়ে দিল আমার।

বললাম—'তোমার কপাল তো খুব গরম।'

কোনো উত্তর দিল না।

—'আচ্ছা, বুকটা একটু দেখতে দেবে?'

আবার ঠোঁট কামড়ে কান্না।

অনেকক্ষণ কান্নার পর বললে—'মাথার থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে?'

ধীরে-ধীরে চুলের থেকে হাত তুলে নিলাম।

—'এখনো বসে আছো?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

মৃদু, অবরুদ্ধ কণ্ঠে—'আচ্ছা এইবার যাও, অনেকক্ষণ তো বসলে।'

ধীরে-ধীরে কল্যাণীর বাঁ হাতটা তুলে নিলাম।

—'কবরেজের মত নাড়ী না দেখলে চলবে না তোমার?'

—'তোমাকে ঢের জ্বালালাম কল্যাণী।'

ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে রইলাম—কল্যাণীর হাতের ভিতরকার নাড়ীর শব্দ। অন্ধকারে কাশের শব্দ।

—'উঠলে?'

—'হ্যাঁ'

—'বুক দেখতে চেয়েছিলে না?'

মাথা হেঁট করে—'থাক্।'

—'কেন? দেখো, তুমি আমার স্বামী, দেখবেই বা না কেন?'

হাত ধরে বিছানার পাশে আমাকে বসালে ধীরে-ধীরে—'আমি চলে যেতে বললেই কি চলে যেতে হয়?'

একটু চুপ থেকে—'কথা বলছ না যে?'

আমার গালে একটা টোকা দিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল কল্যাণী।

বললে—শেমিজের সেফটিপিন কটা খুলে—তারপর, 'নাও, বুক নিয়ে কত পরীক্ষা করতে পার দেখো।'

সেপটিপিন খুলে দাঁত কামড়ে—'নাও তোমার বুক।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

কল্যাণী, 'কেমন দেখলে? খুব গরম?'

একটু হেসে—'যা দেখলাম তা তোমাকে বলব কেন কল্যাণী?'

—'ভাল কথা; দেখা তো হল, এখন সেফটিপিনটা আটকে দি?'

—'দাও।'

—'তোমার মাথাটা আমার বুকের ওপর একটু রাখবে?'

—'মিছিমিছি কী আর দরকার?'

—'কিন্তু আমার যদি ভাল লাগে?'

—'আচ্ছা বেশ।'

কল্যাণী মাথাটা সরিয়ে দিয়ে, 'না না থাক্।'

—'কেন?'

—'না, আমার আর প্রবৃত্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি সেফটিপিন দিয়ে শেমিজ আটকে ফেলে বললে—'তেঁতুল আর মরিচপোড়া দিয়ে ভাত খাই বটে—কিন্তু অনেকগুলো ভাত খাই। খিদেও আছে—মরব না, ভয় নেই। তুমি এখন ঘরে গিয়ে সুস্থিরে ঘুমোতে পার।' নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি দেখে, কল্যাণী, 'আচ্ছা বেশ, কাল থেকে না হয় পান্তা তেঁতুল আর খাব না।'

—'কী খাবে?'

—'যা খাওয়াবে তাই খাব।'

—'পোলাও, মাংস খাওয়াবার শক্তি তো আমার নেই।'

—'চাইও না; কোনোদিন আমাকে মাংস খেতে দেখেছ?'

—'মাংস পেলে তো খাবে।'

—'এ তিন বছরে অন্তত সাত-আট বার এ বাড়িতে মাংস আনা হয়েছে,' কল্যাণী একটু হেসে, 'এমন কোনো ঠাকুর-বাবুর্চি পাবে না তুমি কোনো দেশে, এমন কোনো মশলা পাবে না তুমি পৃথিবীতে যার রান্নার গুণে মাংস আমার কাছে তৃপ্তির জিনিস হয়ে উঠবে কোনোদিন।'

—'ভাল তো, কিন্তু যাক্ সে কথা, কিন্তু আমরা যা খাই তাই খাবে কাল থেকে।'

—'আচ্ছা'

—'একলা খাবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না।'

—'আর একটু দুধ খাবে।'

—'দু'জনে খাব নিশ্চয়ই।'

একটু চুপ থেকে কল্যাণী, 'কিন্তু মাঝে-মাঝে পান্তা আর তেঁতুল খাব।'

—'কেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর পাবে না তুমি আমার কাছ থেকে।'

—'হয় ত এর উত্তর আমিই জানি।'

—'কেউ জানে না—কারুর জানার সাধ্য নেই।'

একটু চুপ করে থেকে কল্যাণী—'তুমি যদি রাজপুত্র হতে আর আমি যদি তোমার রাজপ্রাসাদে থাকতাম, তা হলেও এই পান্তা আর মরিচ খাওয়া ও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কান্না ঘুচত না আমার।'

—'কী যেন ভাবছিলাম।'

কল্যাণী—মা এসেছেন?'

—'না'

—'কোথায়?'

—'দক্ষিণের ঘরে'

—'মেজকাকাদের সঙ্গে গল্প করছেন এখনো?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত তো কম হয় নি।'

—'না, কম হয় নি।'

—'বাবা শুয়ে পড়েছেন?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ।'

—'ঘুমিয়েছেন?'

—'তা বলতে পারব না—হয় তো ঘুমোন নি।'

—'কী করে বুঝলে?'

—'ঘুমোলে একটু মৃদু নাক ডাকার শব্দ পেতাম। খানিক আগে গলা খাঁকরানির শব্দ পেলাম।'

—'আমার মনে হয় বাবা বড্ড একা।'

—'কী রকম?'

—'সারা দিনরাতের মধ্যে মা তার সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না।'

মাথা হেঁট করে চুপ করেছিলাম।

কল্যাণী—'এই তিন বছর ধরেই তো দেখছি আমি, মা বরং পিসিমার সঙ্গে গল্প করবেন, তবুও বাবার সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলবেন না।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'এই জন্য বাবার মনে কেমন একটা ব্যথা আছে—তুমি যখন কলকাতায় চলে যাও, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার স্কুল যায় বন্ধ হয়ে, সারা দিন-রাত কী ভয়াবহ একাকীভাবে তিনি যে কাটান, তা আমি তোমাকে বলে শেষ করতে পারব না। খাঁচার পাখিও এর চেয়ে ঢের আনন্দে থাকে।'

—'আমাদের সকলের জীবনই তো একটা খাঁচা।'

—'তা বলতে পার।'

কল্যাণী বিমর্ষভাবে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

—'যাক্, মা তবুও তোমার মত তেঁতুলের অম্বল দিয়ে পান্তা খান না, কিংবা কপালে একটা বোনা দিয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে যখন—তখন কাঁদেন না।'

একটু চুপ থেকে—'আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকলেও অন্ধকারে নিজের কোঠায় ঠুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে? তাই ত বললে—কেন, কী ব্যাপার কী কল্যাণী?'

একটু চুপ থেকে, 'এই নারী—যাক্ শুনতে চেও না বড় কষ্ট পাবে তা হলে।'

—'আমাকে ভালবাস না এই তো কথা; কিংবা অন্য কাউকে ভালবাস।'

কল্যাণী মুখে কপালে কাপড় টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুল—কপালের যতটুকু দেখা যাচ্ছিল জরাজীর্ণ মানুষের মত কুঁচকে রয়েছে।

ধীরে-ধীরে খুকিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলাম আমি।

বিছানায় আমার পাশে শুইয়ে মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ চেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

—'তুই জেগে আছিস যে রে?'

—'বিত্তি'

—'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, কেমন লাগে?'

—'বাবা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কী মা?'
—'মিছছি কোথায়?'
—মিছরি?'
—'মিছছি খাব।'
—'এখন খায় না মা।'
—'বোতলে আছে।'
—'হ্যাঁ।'
—'খাব।'
—'কাল সকালে খেও।'
—'মিছছি খাব।'
—'সকালবেলা দেব কাল।'
—'বাবা।'
—'কী মা?'
—'মিছছি খাব।'
একটু চুপ থেকে—'মিছরি খেলে পিঁপড়ে কামড়ায়।'
জীবনী শক্তি ঢের কম; পিঁপড়ের কথা শুনে নিস্তব্ধ হল।
মাথায় হাত বুলতে-বুলতে—'তোমার নাম কী খুকু?'
মনের অবসাদে সহসা কোনো জবাব দিল না।
—'কী নাম তোমার?'
অন্ধকারের ভিতর দু-তিনটে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে-ধীরে—'আমাল নাম?'
—'হ্যাঁ'
—'কুকুলানি।'
এমন নিরপরাধ, এমন মিষ্টি অথচ এমন মর্মস্পর্শী।
অন্ধকারের ভিতর আমার চোখের জল দেখল না মেয়েটি। ধীরে-ধীরে বললাম—'খুকুরাণী'
—'কী?'
—'তুমি কাকে ভালবাস?'
—দাদুকে।'
—'আর কাকে?'
—'ঠাকুনকে।'
—'আর কাকে?'
একটু চুপ থেকে—'বাবাকে।'
—'বাবা কোথায়?'
অন্ধকারের ভিতর কচি-কচি হাত আমার চোখ-নাকের উপর বুলিয়ে নিয়ে, 'এই যে বাবা।'
—'মাকে ভালবাস না?'
—'দাদুকে ভালবাসি।'
—'মাকে?'
—'দাদুকে ভালবাসি।'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'না-নিয়ে যাবে না।'
শীর্ণকণ্ঠে উত্তেজনার আওয়াজ বেজে উঠল, 'নিয়ে যাবে না শেয়ালে।'
সন্ত্রস্ত হয়ে বললে—'বাবা—'
—'কী?'
—'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে না?'
—'না।'
—'মাকে ভালবাসি যে আমি।'
—'বেশ।'
—'রামুকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'
—'রামু কে?'
উদ্ধত হয়ে—'নিয়ে যাবে শিয়ালে রামুকে।'
একটু ভেবে—'নন্দুকে নিয়ে যাবে।'
আর একটু ভেবে—'বুলুকে নিয়ে যাবে।'
শিশুর মনের এই অন্ধকার স্রোত ফিরিয়ে দেবার জন্য—'না, কাউকে নিয়ে যাবে না রে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নেবে না?'
—'না, শেয়াল নেই।'
—'নেই?'
নিস্তব্ধভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।
গায় হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম।
বললাম—'তোমার জুতো কই খুকুরাণী?'
—'নেই?'
—'বাবা কিনে দেয় নি?
—'না।'
—'খালি পায় মাটিতে হাঁটো?'
—'হ্যাঁ।'
—'ঠাণ্ডা লাগে যে?'
—'আমার বোতল ভেঙে গেছে।'
—'কিসের বোতল?'
—'দুধের। দাদু কিনে দেবে আবাল'।
—'জুতো কে কিনে দেবে?'
—'দাদু।'
—'তাই তো, দাদু তোমার জীবনের বড় মূল্যবান জিনিস। যখন বড় হয়ে উঠবে তুমি, না থাকবে দাদু, না থাকবে ঠাকুমা, তখন কী করবে তুমি?'
মেয়েটি প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক যেন বুঝেছে, খানিক বোঝে নি। ভবিতব্যতার অন্ধকারে ঘেরা এই পৃথিবীর পথে চলতে-চলতে এক-একটা ইঁদুরের ছানার অবস্থা মাঝে-মাঝে যে-রকম হয়—তেমনি হয়েছে এই মেয়েটির।
—'খুকু একটা ছড়া শুনবে?'
—'ছড়া কী?'
—'কবিতা।'
—'কোপাতা কী?'
—'শোনো।'
—'খুকুরাণী-খুকুরাণী অন্ধকার রাতে'
—'বাবা'
—'কী মা?'
—'আবার বলো—'
—'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বলো—খুকুরাণী-খুকুরাণী, বলো'
—'কুকুলানি-কুকুলানি'
—'অন্ধকার রাতে'
অন্ধকার লাতে'
—'অনেক কথা বলেছিস—এখন ঘুমো।'
'জল খাব বাবা।'
একটু জল গড়িয়ে এনে দিলাম।
গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম উষ্ণতা আরো বেড়েছে যেন।
—'খুকু'
—'উ?'
—'ব্যথা করে?'
—'বেথা কোলে।'
—'কোথায়?'
—'বাতাস দাও।'
বাতাস দিতে-দিতে— খুকুরাণী।'
—'উঁ'
—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে—'
আমার গলা জড়িয়ে ধরে—'না।'
—'তুমি দাদুর কাছে থাকবে—'
—'না, দাদুকে শেয়ারে খেয়ে ফেলেছে।'
একটু হেসে—'তা হলে ঠাকুরমার কাছে থাকবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'উঁহু না—ঠাকুনকে শেয়ালে নিয়ে গেছে যে।'

—'মার কাছে থাকবি।'

উৎপীড়িত হয়ে—না, থাকব না।'

—'মিছরি দেবে যে মা, দেবে, লবেনচুশ দেবে, বিস্কুট দেবে।'

লুব্ধ চোখ অন্ধকারের ভিতর ঘুরতে লাগল।

—'আমি কলকাতায় চলে গেলে মা তোমাকে মিছরি দেবে, লজেন পাবি, বিস্কুট পাবি।'

—'বিসকুট!'

—'থাকবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কার কাছে?'

—'মার কাছে।'

—'আমি কলকাতায় চলে যাব যে।'

—'হ্যাঁ তুমি চলে যাবে।'

—'আর আসব না।'

মাথা নেড়ে বললে—'না, আর আসবে না।'

দেখলাম মুখের ভিতর কোনো ভাব পরিবর্তন নেই।

কলকাতায় যাওয়া যে কী, যাওয়া-আসারই বা কী মানে, তা বুঝবার মত বোধ এখনো হয় নি।

—'আর আসব না যে খুকি।'

—'না—'

—'কলকাতায় চলে যাব, আর আসব না।'

মাথা নেড়ে—'না আসবে না। দাদু আছে, ঠাকুন আছে, মা আছে, ভুলু আছে, রবি আছে, খোকন আছে।'

—'আর বাবা?'

—'রবি, ভুলু, খোকন, মিনু আছে, খেলা করবে।

আজকের জন্য এর এই রকম, ভবিষ্যতে এমনি কোনো ভবিতব্যতার বেদনায় কিংবা সফলতার শান্তিতে হারিয়ে যাবে তুমি—কোলাহলে-কোলাহলে দূরের থেকে দূরে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব, আমাকে হারিয়ে ফেলবে তুমি—হয় ত পলক ফেলতেই দেখব, জীবনে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, পরের ঘরে চলে গেছ, দূরের বন্ধু হয়েছ, বছরের পর বছর ঘুরে গেলেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তাগিদও বোধ কর না, তুমিও না, আমিও না। আজও তুমি রবির কথাটা বল, খুকুরাণী।

ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

খুকি ঘুমিয়ে গেছে, মশারির চালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে।

আরো অনেক গভীর রাতে খুকির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হয় ত কোনো মেয়েদেরই স্কুলে মাস্টারি করবে কিংবা বিধবাশ্রমে যাবে, কিংবা অবলাশ্রমে, হয় ত কোনো নারী কল্যান সমিতির সাহায্যের জন্য দরকার হবে। কিংবা হিন্দু মিশনের। অথবা পৃথিবীর সমস্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও কৃপার অগোচরে জীবনের অন্ধকার সমুদ্রের পরিহাস ও অট্টহাসির ভিতর হাহাকার করে ফিরবে।

পরের দিন রাতে বিছানায় আমার পাশে খুকিকে শুইয়ে দিয়ে—

—'আমি রেলগাড়িতে চড়ে কলকাতায় যাব।'

—'নেলগালি?'

—'হ্যাঁ'

—'নেলগালি কী বাবা?'

—'কোনোদিন দেখিস নি?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'এখান থেকে সন্ধ্যার সময় নৌকায় চড়ে তার পর ইস্টিমারে উঠতে হয়, তার পর কাল সকালে রেলগাড়িতে চড়তে হয়।'

—'খুকি চুপ করে ছিল।'

বললাম—'রেলগাড়িতে চড়ে যাবি?'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'ভুলুর কাছে।'

—'ভুলুর কাছে যেতে রেলগাড়ি লাগে না রে।'

—'বাবা আমাল ইজেল ছিলে গেছে।'

—'ছিঁড়ে গেছে!'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আচ্ছা, আমি নতুন ইজের করে দেব।'
—'দাদু বোতল কিনে এনে দেবে।'
—'বোতল?'
—'হ্যাঁ।'
—'ইজেল কিনে আনবে।'
—'ইজেরও আনবে দাদু?'
—'বিস্কুট আনবে, লজেন আনবে, পুতুল আনবে।'
—'বাবা আনবে না।'
মাথা নেড়ে, 'না, দাদু।'
এর পিতা এর জীবনের রক্তমাংসের জন্য দায়ী শুধু, অন্য সমস্ত দাদু।
—'খুকুরাণী?'
—'উঁ?'
—'আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?'
—'হ্যাঁ'
—'মেসে গিয়ে থাকতে হবে।'
—আগ্রহের সঙ্গে—'আমি যাব তোমাল সঙ্গে বাবা।'
—'মেসের চৌবাচ্চার সমানে দাঁড়িয়ে স্নান করবি, বারান্দায় দৌড়াবি, রাস্তায় ছেলেরা এসে যে-ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে দলে মিলে যাবি, আমার কোলে বসে থাকবি, পাথর কাঁকর ভরা ভাত আর গোরুর মাসকলাই, ঠাণ্ডা ট্যাড়সের তরকারি আর ছিবড়ের মত মাছ: যাবি রে?'
—'যাব।'
—'বেশ, আর আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাব তখন তুই কী করবি?'
চুপচাপ।
—'একটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেব তোমাকে; না?'
মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'
—'খুব লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমুবে।'
—'হ্যাঁ'
—'মেসের বাবুদের ঝালাপালা করবে না তো?'
চুপ করেছিল; বললাম 'বলো, করব না।'
—'কলব না।'
—'তারা যদি কান মলে দেয়, কাঁদবে না।'
—'না।'
—'তাদের মুখের পানের ছিবড়ে যদি তোমাকে খেতে দেয়, খাবে?'
—'হ্যাঁ, খাব।'
—'মেসের বাবুরা বড় দুষ্টু যে রে খুকি, বিড়ির আঁস দিয়ে তোমার পিঠে ফোশকা ফেলে দেবে, চুরুটের ছাই দেবে তোমার চোখে-নাকে ঝেড়ে, দিন-রাত চুল টেনে-টেনে পাখির বাচ্চার মত মাংস বের করে দেবে তোমার মাথায়। ফড়িঙের মত করে দেবে যে রে।'
অবোধ ভাবে শুনছিল মেয়েটি।
ধীর-ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে—'না, রে, মেসে গিয়ে কাজ নেই।'
একটু চুপ থেকে, 'আমারও আর ইচ্ছে করে না যেতে। তোমাকে নিয়ে এই খড়ের ঘরে সারাটা জীবন যদি কাটাতে পারতাম খুকুরাণী।'

আজ রাতে বৃষ্টি নেই।
কদমগাছে একটা পেঁচা বসে ডাকছিল।
মেয়েটি—'ঐ কে ডাকে বাবা—'
—'লক্ষ্মী পেঁচা'
—'কেন ডাকে? কাঁদে?'
—'না কাঁদে না।'
—'কী কলে?'
—'বেড়াতে বেরিয়েছে।'
—'বেলাতে?'
—'হ্যাঁ, আজ বৃষ্টি নেই কি না।'
—'কোথায় বেলাতে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই গাছে-গাছে, মাঠে-মাঠে।'

চুপ করে ভাবছিল।

খানিকক্ষণ পরে—'আমি মাঠে যাব।'

—'কাল সকালে যেও'

—'ভুলুর সঙ্গে খেলা কলব না?'

—'হ্যাঁ।'

—'নন্দু আসবে, রবি আসবে...'

তেঁতুল গাছের ভিতর থেকে বক ডেকে উঠল, ঘরের পাশের মস্ত বড় পেয়ারা গাছের নিবিড় ডালপালার উপর গোটা দুই বাদুড় ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝাড়া খেয়ে খানিকটা শিশির না বৃষ্টি পড়ার শব্দ—খুকুর চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর সমস্ত গন্ধ, রস, স্মৃতি ও শব্দের দিকে হৃদয় রয়েছে যেন জেগে—আজ ওর বেশি জ্বর নেই।

খুকু পাশ ফিরে শুল একবার—পঁচিশ বছরের পুরনো কাঁঠালের খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে।

ধীরে-ধীরে শিরদাঁড়ায় আঙুল বুলুচ্ছিলাম—একটা টিকটিকির মত মেরুদণ্ডে যেন—শুকনো বাঁশপাতার মত চিমসে শরীর। মা আছে, বাবা আছে, দাদু আছে, ঠাকুরমা আছে তবুও যেন মনে হয়, ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশ রুগ্ন একটা বিড়ালের ছানার মত, ক্ষমাহীন পৃথিবীর পথে-বিপথে, এঁটো ও ঝাঁটা খেয়ে বেড়াবার জন্য এর জন্ম ও জীবন। মেসে যখন থাকি—দুপুরবেলা সমস্ত মেস নির্জন—বিছানায় বসে বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি, দু-একটা চড়ুই নিঃশব্দে লাফিয়ে—লাফিয়ে সমস্ত বারান্দা ঘুরে দু-এক টুকুরো খুদের সন্ধানে ফিরছে; এর ভিতর বেদনার তো কিছু নেই; কিন্তু তবুও মনে আঘাত লাগে যেন কেমন, আমার মেয়েটির কথা মনে হয়, চড়াইয়ের ছোট্ট নিঃসহায় মুখ, করুণ ঠ্যাং, অসম্পূর্ণ অকৃতকার্য দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে একটি আড়াই বছরের শিশুর রূপ মনে জাগায়।

খুকি যখন দেশের বাড়িতে জন্মেছিল, তখনো আমি কলকাতার মেসে ছিলাম। দিনের পর দিন ভয়ে, সন্দেহে বিক্ষুব্ধতায়, পৃথিবীতে এই শিশুটির আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

কে জানে, সে হয় তো মৃত হয়ে জন্মাবে; কিংবা তার জীবনের বিনিময়ে জননীকে মৃত্যুর দায় দিতে হবে? কে জানে, অন্ধ হয়ে জন্মায়ে, হয় তো এই শিশু? কিংবা অঙ্গহীন হয়ে? হয় তো মুখ বধির হবে? কিংবা অত্যন্ত অজ্ঞান জড়ের মন নিয়ে পৃথিবীতে আজন্মকাল নিজেকে পরিহাস করে চলে যাবে? হয় তো, মৃত হয়ে জন্মালেই ভাল।

পিতার হৃদয়ের এই রকম অনেক বিবর্ণ হতাশ অমঙ্গল চিন্তার মধ্যে এর জন্ম; গর্ভে যখন ছিল এই মেয়েটি এর মায়ের হৃদয় তখন বর্ণহীন রূপহীন সাদা করবীর একটা শাখার মত, মেহন্তের সন্ধ্যার কুয়াশা ওদিকে তাকিয়ে আছে। গর্ভজাত শিশুর জীবন সম্বন্ধে আশা খুব কম ছিল ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম সন্তান প্রসবের পর একটা টেলিগ্রাম আসবে, আসতও, কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে বাড়ির লোকেরা টেলিগ্রাম করলে না আর। বিলম্ব করে, অবহেলা করে একখানা পোস্টকার্ড লিখে সংবাদটা জানাল আমাকে। টিকটিকির মত মেরুদণ্ডসার এই মেয়েটি বিধাতা ও মানুষের এতই উপেক্ষার জিনিস? সুস্থ, সুগোল, সুন্দর শিশুকেই শুধু সম্ভব করতে হবে—আদর করতে হবে? যে-সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে সকলের মনে সন্দিগ্ধতা সৃষ্টি করে, জননীর মন দেয় নিরাশায় ভরে—অন্ধ চোখ নিয়ে যে পৃথিবীতে নেমেছে, কিংবা কথা কইবার শক্তি যে সঙ্গে করে আনতে পারে নি, কিংবা শুনবার, বুঝবার, গ্রহণ-করবার শক্তিকে যে কোন দূরান্তের পথে রেখে এসেছে, কিংবা যার দেহের নির্জীবতা কাদাখোঁচার ছায়ার মত, চড়াইয়ের মত, হেমন্তের বিকেলের শুকনো পাতার রাশের ভিতর বালি-হাসের বিবর্ণ ডিমের মত, পৃথিবীর হৃদয় যেন তাদের সম্বন্ধে নিজেকে সময়ে-অসময়ে অবারিতভাবে ব্যয় করতে কেন এমন কুণ্ঠিত হয়? আনন্দ-উৎসবই কি জীবনের সবচেয়ে বড় কথা? সহানুভূতি—

তাকিয়ে দেখলাম জেগে আছে।

—'কী ভাবছিস রে?'

কোন উত্তর দিল না।'

—'খাবি কিছু?'

—'হ্যাঁ খাব।'

—'কী খাবি?'

—'আমি গুল খাব বাবা।

—'গুড়?'

আকাঙ্ক্ষা খুব সাধারণ। এর চেয়ে ভাল জিনিসের কল্পনা এর জগতে নেই।

—'চকোলেট খাবি রে?'

চুপ করে রইল। চকোলেট কী জানে না অবিশ্যি–

—'টফি?'

এবারও নিস্তব্ধ; ভাবলে, ঠাট্টা করছি।

—'কী খাবি রে?'

কোথার থেকে একটা গঙ্গাফড়িং, তেলাপোকা, চামচিকা, ফড়ফড় করে উড়ে এল—ঘরের ভিতর ক্লান্তিহীনভাবে ঘুরতে লাগল।

চামচিকাটার দিকে তাকিয়ে চোখ ধীরে-ধরিে ভারী হয়ে এল মেয়েটির; ঘুমিয়ে পড়ছিল, একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গুড় খাবি না রে?'

—'কই?' উঠে বসে হাত পেতে বললে।

ধীরে-ধীরে আস্তে-আস্তে শুইয়ে দিয়ে মাথায় আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে লাগলাম—'গুড় কাল সকালে খাবে; কেমন?'

—'আচ্ছা।'

—'নলেন গুড না?'

—'হ্যাঁ।'

অন্যমনস্ক হয়ে অবাস্তব কথা ভাবছিলাম, কিছুক্ষণ পর ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমিয়ে যাচ্ছে।

আরো দু-তিন দিন কেটে গেছে।

সকালবেলা বাবা স্কুলের ছেলেদের খাতা দেখছিলেম। ছোট্ট-ছোট্ট টেবিলে বই, ডিকশনারি খাতাপত্র, দোয়াতকালির স্তূপ—

মা এসে বললেন, 'একটা ছোকরা চাকর রেখেছি।'

—'রেখেছ?'

-'হ্যাঁ।'

—'কী নাম চাকরটার?'

—'হরিচরণ।'

—'তুমিই রাখলে?'

—'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবার সময় ছিল না।'

—'কবে রেখেছ?'

—'আজ সকালেই'।

—'কত মাইনে?'

—'পাঁচ টাকা। রাখতে হয়েছে সুরেশবাবুর জন্য। চাকর ছাড়া ওর বড় কষ্ট।'

দেখতে-দেখতে পিসিমা এসে দাঁড়ালেন।

বললেন—'মেজদার জন্য চাকর না রেখে দিলে চলে না তো দাদা।'

বাবা—'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

—'এই তো কাল পায়খানায় যাবেন—আমরা কেউ ঐ দিকে ছিলাম না, কে ঘটিতে জল দেবে, প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হল।'

—'দশ মিনিট? তাই তো চাকর থাকলে এ-রকম বিপত্তি তো হত না।'

—'গাউটটা বেড়েছে কি না, কলকাতায়ও যেতে পারেন না, পায়ে মালিশ করে দেবার লোকেরও নিতান্ত দরকার।'

বাবা—'তা সুরেশ আমাকে আগে বললেই পারত; এসেছে তো দশ দিন, চাকর ছাড়া এত দিন তা হলে খুব কষ্টেই কাটাল।'

পিসিমা—'তা যা হবার তো হয়ে গেছে।'

—'তোমার টানাটানির সংসার দেখে মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারে নি হয় তো।'

—'আমার কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল একটা চাকর ছাড়া বর্ষার মধ্যে ওর হবে কী করে?'

পিসিমা—'মনে হলেই তো শুধু হয় না, ব্যবস্থা করতে হয়।'

—'তা ঠিক; যাক, তুমি না হয় আমার হয়ে বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছ।'

—'এর মাইনে কিন্তু পাঁচ টাকা।'

-'শুনেছি।'

—'একটা কথা কিন্তু দাদা।'

—'বলো।'

—'মেজদা হয় ত টাকাটা আপনাকে দিতে চাইবে কিন্তু আপনি নেবেন না।'

—'ওঃ, সে কথা কি তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

—'তা হলে মেজদাকে আমি একটা কথা গিয়ে বলব?'

—'কী কথা?'

—'বলব যে দাদাকে টাকা নিয়ে সাধতে যাবেন না। তা হলে দাদা বিরক্ত হবেন।'

—'আমি জানি সুরেশ আমাকে টাকা নিয়ে সাধতে আসবে না।'

—'কী রকম?'

—'সে জানে সে তার দাদার বাড়িতে আছে।'

—'কই? দু'ভায়ে বনিবনা কোথায়?'

—'কেন? কী রকম?'

—'তার খাবার সময় তুমি গিয়ে দাঁড়াও?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'সকালবেলা তো আমি স্কুলে চলে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ, রাতেরবেলা?'

—'আমি খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি এই আমার চল্লিশ বছরের অভ্যাস—সুরেশের খাবার সময় তদারকের জন্য খোকাকে পাঠিয়ে দি তাই—খোকার মা তো আছেনই—তা তুমি যদি মনে করো আমি না যাওয়াতে সুরেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তা হলে আজ থেকে আমি গিয়ে বসব।'

—'বসবার দরকার নেই।'

—'দরকার নেই?'

—'একটু বসে পায়চারি করে চলে আসলেই হবে, আপনি ওখানে গিয়ে বসলে মেজদার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে।'

—'কেন?'

—'অন্তত কথাবার্তার ধারা বদলে যাবে, আধ্যাত্মিক হয়ে উঠবে।'

—সেটা তোমরা চাও না অবিশ্যি।'

—'না।'

—'আচ্ছা, তা হলে গিয়ে দু-চার মিনিট পায়চারি করা যাবে।'

—'হ্যাঁ, দু-এক মিনিট থেকে, আপনি আপনার ঘরে চলে গেলে, কেউ আপনার পথ আটকাতে যাবে না, লৌকিকতাও বজায় থাকবে।'

—'বেশ কথা, বেশ কথা।'

—'হরিচরণ কিন্তু একান্তই মেজদার।'

—'ত ছাড়া আবার কার? সুরেশের জন্যই তো রাখা।'

—'না, সেই কথাটাই সব সময় যেন আপনাদের খেয়ালে থাকে। সেই জন্যই বলছিলাম।'

মা—'বৌমা হয় তো মাঝে-মাঝে কিছু ফরমাস দিতে পারে।'

—'তা যেন না দেয়।'

একটু কেশে পিসিমা—'রান্নাঘরের কোনো কাজ হরিচরণ করতে পারবে না।'

বাবা—'না, রান্নাঘরের জন্য তাকে তো রাখা নয়।'

—'বাজারে হেম যেমন যাচ্ছিল তেমনি যাবে। আপনারা ওকে জল তুলে বা কাপড় কেচে দিতে বলতে পারবেন না। এ-সব বৌমা আর বৌঠান যেমন করছিল তেমনই করবে। সন্ধ্যার বাতিও বৌমাই জ্বালবে।'

বাবা হেসে, 'কারুর কোনো আপত্তি নেই।'

—'হরিচরণ মেজদার হাত-পা টিপে দেবে, কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবে। বিছানা পাতবে, ঘর ঝাঁট দেবে, জিনিস পত্র সাজাবে-গোছাবে, পাইখানার জল দেবে, পাকা চুল বেছে দেবে—এই সব আর-কী?'

—'বেশ কথা; এখন চাকরটা কী-রকম হয়' আনাড়ি হলে তো সুরেশের বড্ড কষ্ট।'

—'না, সে বেশ চালাক আছে।'

—'গায়ে-পায়ে কাজ করতে পারবে বেশ?'

—'তা ফুর্তিতে সকাল থেকেই তো কাজে লেগে গেছে।'

—'বেশ।'

-'মেজদার গা টিপছে সেই সকাল থেকে।'

—'সুরেশের গাউট বাড়ল না কি আরো?'

—'বাড়েও নি কমেও নি—যেমন ছিল তেমনি আছে তবে না-টিপলে কষ্ট লাগে।'

—'দেখো, চাকরটা যেন বেশ মোলায়েমভাবে টিপতে পারে, আর হাত, পা, ঘাড় টিপবার আগে কখনো যেন তামাক না খায়।'

—'মেজদা চেয়েছিলেন জমিদারি স্টেটে ম্যানেজারি করতে, ঢের বড়-বড় চাকরি পেয়েছিলেন—আমি বললাম, থাকরে বাপু, হাতে-পায়ে এত, বয়সও তো কম নয়, তোমার এখন সেবা শ্রদ্ধা পাবার বয়স, সুস্থিরে বসে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকবে, মানুষকে ধর্ম উপদেশ দেবে, পথ দেখাবে, এই আর-কী।'

মা বললে, 'হরিচরণকে তিন বেলা খাবার দিতে হবে। হ্যাঁ তিন বেলা ভাত দেব কড়ারে নিয়েছি, সুরেশবাবু আচ্ছা ছেলে মানুষ।'

—'খাবে তো! না হলে কাহিল শরীরে কী কাজ করবে?' বাবা সাদা গোঁফে হাত বুলিয়ে—'যা খেতে পারে, খাবে।'

একটু গলা খাঁকরে—'মানুষ তো ক্ষিধের অতিরিক্ত কিছু খায় না।'

মা একটু চিন্তিতভাবে—'তিন বেলা এক জন চাকরের অন্তত দেড় সের চালের ভাত লাগবে।'

—'লাগলে লাগবে? এ নিয়ে তুমি ভাবছ কেন বড় বৌ।'

—'না, টেনে-হিঁচড়ে সংসার চলছে কি না।'

—'তা, আমি না হয় বলব মেজদাকে চালের টাকাটা দিতে। এক টাকা করে তো চালের মণ।'

মা তাড়াতাড়ি পিসিমার মুখে হাত চাপা দিয়ে—'খবরদার, এমন কাজও করো না ঠাকুরঝি।'

—'দাদা বললে অবশ্য মেজদাকে গিয়ে লাগাতাম; তোমার কথার কী-আর মূল্য বৌঠান; তুমি তো বাজারের ঘটি-বাটি।'

খানিক দূর গিয়ে পিসিমা ফিরে এসে বাবার দিকে তাকিয়ে—'আমি কিন্তু মেজদার সঙ্গে কলকাতায় যাব।'

—'তা একবার গিয়ে বেড়িয়ে এলে—বেশ তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেড়িয়ে আসা শুধু নয়।'

—'তবে?'

—'পুজোর সময় আমাকে আনবার জন্য হেমকে যদি পাঠাও তা হলে আমি আসব না।'

—'কেন?'

—'চালের দর নিয়ে যারা কষাকষি করে সে-সব চামারের বাড়ি আমি থাকি না।'

কিছু না বলে পিসিমা হন হন করে চলে যাচ্ছিলেন। মা ডাক দিলেন—

দাঁড়ালেন না, কিংবা পিছে তাকালেন না।

—'তোমার দাদা তোমাকে ডাকছেন।'

পিসিমা ফিরে এলে, বাবা—'কই আমি তো তোমাকে ডাকি নি।'

মা বিহ্বল হয়ে বললেন—'আচ্ছা বেশ, আমিই ডেকেছি—আমার ডাক বুঝি শুনতে নেই?'

বলে ঝুপ করে পিসিমার থানের আঁচলখানা ধরে নিজের মুটির মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে কানে-কানে কথা বলতে—বলতে গলাগলি হয়ে পেয়ারা গাছটার দিকে চলে গেলেন দু'জনে।

পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা কথাবার্তার পর পিসিমা পাড়ার দিকে চলে গেলেন।

মা এসে বললেন, 'শুনছ?'

বাবা খাতার থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

—'চামার বলুক, কসাই বলুক, আমাদের অভদ্র সেজে কী লাভ?'

বাবা চোখ নামিয়ে লিখতে লাগলেন।

—'রাগ করেছ?'

—'ঐ রকমই বলে।'

—'আমাকে বললে বাজারের.....!'

কল্যাণী চলে যাচ্ছিল, মা একটু থমকে থামলেন।

বাবা–'কল্যাণী চলে গেল যাক, এ সব প্রসঙ্গ তুলে কোনো লাভ নেই, আমার স্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

—'আজ যে দুধ খেলে না, ক দিন ধরে দুধ খাচ্ছ না যে?'

—'দুধ হজম হচ্ছে না।'

—'চা আর মুড়ি তো খুব হজম হয়।'

—'আচ্ছা, এর মানে ডিকশনারিতে দেয় নি কেন খোকা?'

—'এটা কার ডিকশনারি?'

—'অক্সফোর্ডই তো'

—'দেয় নি? কী জানি।'

—'কোথায় পাব তবে?'

—'নিউ ইংলিস ডিকশনারিতে আছে হয় তো।'

—'হ্যাঁ। তা কোথায় পাই?'

—'এখানে কারো আছে বলে তো মনে হয় না।'

বাবা একটু চুপ থেকে—'নবাব হামাম মিঞার খুব বড় ডিকশনারি আছে।'

—'আছে না কি?'

—'হ্যাঁ বেশ নামজাদা।'

—'নবাবজাদা কোথায় থাকেন?'

—'সে প্রায় মাইল তিন-চারের পথ।'

—'আগে তো ছিলেন নদীর দক্ষিণ দিকে এক চর, না শকুন চর, কী বলে তারই পাশে।'

বাবা বাধা দিয়ে—'সে বাড়ি নদীতে ভেঙে গেছে। এখন একেবারে নদী এড়িয়ে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে ভিতরের দিকে বাসা করেছেন।'

একটু গলা খাঁকরে, 'তোমাকে—চিনিয়ে দিচ্ছি।'

এক চিলতে সাদা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'দেখো।'

মিনিট পাঁচেক পরে—'চিনলে?'

—'হ্যাঁ, ওদিকে আগে তো বন-জঙ্গল ছিল বলে জানতাম।'

—'একটা মস্ত বড় প্রান্তরও ছিল। এখন বসতি হয়েছে অনেক। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমির ওপরে চমৎকার সুন্দর বাড়ি নবাবজাদার।'

—'কী রকম বই আছে লাইব্রেরিতে?'

—'প্রায় হাজার তিরিশেক বই। প্রায়ই ইংরেজি ক্লাসিক।'

—'তুমি গিয়েছ সেই লাইব্রেরিতে?'

—'হ্যাঁ গিয়েছি কয়েকবার।'

—'নতুন বই আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'প্রত্যেক সনেই তো বই কিনছেন। খুব যা-চাও সে-রকম বই পাবে আশা করি।'

—'গেলে হয় এক দিন।'

—'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের চিঠি নিয়ে যেও।'

বাবা বলতে লাগলেন, 'শব্দটার মানে দেখে এসো, শুধু শব্দার্থ নয়, সেটা আমি জানি খানিকটা, আমি চাই এই শব্দটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা।'

বাংলা খবরের কাগজটা পড়ছিলাম। দক্ষিণের ঘরে শুনছিলাম মেজকাকা ও মায়ের হাস্য কলরব বেশ জমে উঠেছে।

পিসিমা গলায় আঁচল জড়িয়ে এসে—'দাদা।'

খাতার থেকে চোখ না তুলেই—'কী, কী মনে করে?'

—'মেজদাকে যে রোজ মিঠাই কিনে দেওয়া হচ্ছে সে কথা তোমাকে বলি নি।'

—'না, শুনি নি আমি।'

—'রোজ বিকেলে, রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া, অমৃতি খান।'

—'বেশ তো, বাজারের থেকে না এনে ঘরেই করে দিতে পারত।'

—'তা, পয়সা অনেক জমে গেছে। ক্ষিতীশ আমাকে বললে—বাকিতে আর আমি দিতে পারব না।'

—'ক্ষিতীশকে খাতা নিয়ে আসতে বলো।'

—'আচ্ছা।'

—'আর একটা কথা।'

—'বসে বলো, দাঁড়িয়ে রইলে? হেম একটা মোড়া এনে দাও।'

—'না, না, আমার বসতে হবে না, এক মিনিট শুধু।'

চৌকাঠের ওপর বসে—'মাঝে-মাঝে গাড়িতে বেড়াতে গেছেন, সেই ভাড়াটা।'

—'আচ্ছা।'

—'আর একটা ইংরেজি খবরের কাগজ রোজ দিতে বলবেন।'

—'অমৃত বাজার কি একটা রাখা হয় না হেম?'

—'মেজকাকা স্টেটসম্যান চান।'

—'বেশ তাই রেখো; যার যাতে তৃপ্তি হয় তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে লাভ নেই ত কিছু।'

পিসিমা—'কাপড় কাচ' সাবানের জন্য কিছু পয়সা দেবেন?'

—'এক সের সাবান?'

—'হ্যাঁ, ধরুন, আড়াই সের আন্দাজ।'

—চাবি তো ওর কাছে। বলো গিয়ে, যত পয়সা লাগে দেবেন।'

বাবা গুন-গুন করে গাইতে গাইতে উঠলেন। সংস্কৃত একটা শ্লোক। হয় তো উপনিষদের।

মাইনে অবিশ্যি পঞ্চাশ টাকা। ধার, পাঁচ হাজার পেরিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর খুকিকে ঘুম পাড়িয়ে বাবার কোঠায় গিয়ে বসলাম। সদর রাস্তার দিকের দরজাটা বাবা বন্ধ করে স্কুলে চলে গেছেন, খুলে দিলাম দরজাটা। দিব্যি আলো ঘরের ভিতর ঢুকল, ফুরফুরে মেঘলা বাতাস। কয়েক হাত দূরে সবুজ নিবিড় কৃষ্ণচূড়া গাছটা দাঁড়িয়ে—এখনো ইতস্তত কিছু ফুল ফুটে আছে।

একটা টুল নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলাম।

পায়ের শব্দ শুনেই তাকিয়ে দেখি মা পান বিচুতে-চিবুতে দাঁড়িয়েছেন।

—'খাওয়া হয়ে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে খেলে আজ?'

এ প্রশ্নের উত্তর মা কোনোদিনই দেন না, আজও নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বললাম—'বসো।'

—'না, ঢের কাজ আছে।'

—'কোনো সময়ই তো তুমি বসতে চাও না।'

কোনো জবাব দিলেন না।

—'তোমাকে কখন আমি পাই বলো তো?'

এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।'

—'সকালবেলা ঘুমের থেকে উঠে দেখি তুমি রান্নাঘরে চলে গেছ। কত সকালে যে যাও তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।'

—'না-গিয়ে উপায় কোথায়?

—'শুধু সেই জন্যই না, আমার মনে হয় যেতে তোমার ভাল লাগে।'

—'তাই তোমার মনে হয় বটে।'

—'তাই না মা? উকিলের যেমন কোর্টে যেতে ভাল লাগে, ডাক্তারের যেমন হ্যাট-কোট পরে স্টেথিস্কোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে খুব উৎসাহ, দালাল যেমন নাকে-মুখে গুঁজে ছাতি নিয়ে ছুটতে ভালবাসে, হেঁসেল হয়েছে তোমার তাই।'

নীরব ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই বৃষ্টির ভোরে বিছানায় একটু শুয়ে থাকতে কত ভাল লাগে মানুষের। তুমি সব অগ্রাহ্য করে অন্ধকার থাকতে একটা গামছা মাথায় ফেলে বৃষ্টি ভেঙে রান্না ঘরে দাও ছুট।'

—'চুনে দেখছি জিব পুড়ে গেছে।'

—'তার পর রান্না ঘরে গিয়ে কী করো?'

—পানটা নিশ্চয়ই বৌমা সেজেছিল আজ।'

—'উনুন জ্বালাও? না আগেকার দিনের বাসন মাজো?'

—'বৌ এত চুন খায়?'

—'হ্যাঁ চুন খেতে খুব ভালবাসে, শরীরে ক্যালসিয়াম খুব কম কি না।'

—'ক্যালসিয়াম কী?'

—'যা দিয়ে হাড় তৈরি হয়; কল্যাণীর সেই জিনিসের খুব অভাব, তার মেয়েরও। দু'জনেরই রিকেট।'

—'রিকেট কাকে বলে?'

—'যাদের শরীরে চুন জাতীয় জিনিস, আরো নানা রকম সার পদার্থ ঢের কম, ভিটামিন কম, ভিটামিন এ-বি-সি-ডি জীবনী শক্তির যত সব মাল-মশলা সবই নিবন্ত প্রদীপের মত জ্বলছে আর কি।'

—'আজ বড্ড চুনা দি'য়ছে এই পানে। আমি এক শ বার নিষেধ করে দিয়েছি তবু যদি কানে ঢোকে। এরপর দেখছি একটা পান নিজের তৈরি করে খেতে হবে।'

—'আগের রাতের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আগে মেজে নাও?'

—'তোমার বৌ তো আর মেজে দেবে না আমাকে'।

—'তারপর উনুন জ্বালাও?'

—'না, বাসন আগের রাতে মেজে রাখি।'

—'রোজই? সমস্ত?'

—'হ্যাঁ, তবে কি আবার থোক—থোক করে মাজব না কি?'

—'চেপে যে-দিন ঝড়-বৃষ্টি আসে।'

—'বললাম তো, রোজই মেজে রাখি রে। তুইও নিজের চোখে দেখেছিস কত? আজ যে বড় জিজ্ঞাসা?'

—'আগে তো ছাতা নিতে না।'

—'এখনো নেই না।'

—'বৃষ্টিতে এত ভিজতে পারে মানুষ?'

—'ঘাটলার পাশে মস্ত বড় জাম গাছটা আছে রে।'

—'তাতে বৃষ্টি সানায়।'

—'সানিয়েই তো যায়, এক রকম দেখি।'

—'সকালবেলা প্রথম উনুন জ্বালাও গিয়ে?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'উনুন জ্বালানো কি সোজা ব্যাপার মা, বিশেষত এই বৃষ্টি বাদলের দিনে সমস্তই থাকে স্যাঁতসেঁতে হয়ে। সমস্ত বাড়িঘরে শুকনো ডালপাতা জোগাড়, কয়লা ভাঙা, গোবর দিয়ে মেখে ঘুটে তৈরি করা।'

—'বড় তো ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে বসলি রে? খুকি ঘুমিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর বৌমা?'

—'পড়ছে বোধ হয়।'

—'কী বই?'

—'কিংবা লিখছে।'

—'চিঠিই লিখছে বোধ করি।'

—'কাকে?'

—'তা তো আমি জিজ্ঞেস করি নি।'

—'জিজ্ঞেস করলে, বলে কি সব সময়?'

—'কেনই-বা বলবে? আমরা কেউ-বা কাকে জীবনের সব কথাটুকু বলি?'

হাসতে লাগলাম।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বললেন, 'যাই।'

—'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তো রইলে এতক্ষণ বসলেও না।'

—'যাই, একটু ঘুমোই গিয়ে।'

—'ঘুমোবে না তুমি নিশ্চয়ই।'

—'কী করব তা হলে?'

—'ঘুমোলেও আধ ঘণ্টার বেশি নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন? তার পর কোথায় যাব?'

—'সে সব তুমি জান, তবে দুপুরে আধ ঘন্টা-তিন কোয়াটারের বেশি ঘুমোতে দেখি নি কোনো দিন; কোনো দিন একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ বই পড়তেও দেখি নি; পাড়ায় কড়ি খেলা বা বিত্তির মজলিশে পনের মিনিটের বেশি তুমি টিকতে পার না; সেলাইয়ের কলের ইতিহাস তোমার জীবনে নেই; না আছে নকসি কাঁথা, মোজা, টুপি বুনবার।'

—'সমস্ত সময়ই রান্নাঘরে থাকি বুঝি?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে?'

—'মানুষকে আপ্যায়িত করতে, কথাবার্তা বলতে, আসর জমাতে, খুবই পার তুমি কিন্তু—'

একটু চুপ থেকে—'সময়ের অভাবে কিছুই হল না তোমার।' মা ঈষৎ প্রসন্ন ও বিমর্ষ মুখে—'যার যেমন ভাগ্য।' ঈষৎ বিরস ও খানিকটা প্রফুল্লভাবে—'অবিশ্যি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেই না আমি, বিধাতা আমাকে যা দিয়েছেন'—পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কলের মত আউড়ে গেলেন। এখন সময় বিশেষে বিক্ষোভও যাতনা। অন্য সময়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি।

ভাবলেন নিজের জীবনের জবাবদিহি দেওয়া হয়ে গেছে।

—'হ্যাঁ সময়ের অভাবে কী হল না তোমার? এই তো তিন মাস ধরে এখানে এসেছি-দিনের ভিতর কতবার তোমাকে চেয়েছি। কিন্তু সব সময় শুনেছি অনেক কাজ। কোনো সময় নেই।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'বাবাও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান' বলতে পারলে ভাল লাগে তার—'

বাধা দিয়ে মা—'এমন মিথ্যা কথা বলো না তুমি।'

—'মিথ্যা নয়, সত্য কথা।'

—'চব্বিশ ঘণ্টা তিনি নিজের কাজ নিয়ে আছেন।'

—'না চব্বিশ ঘণ্টা নয়, অনেকটা সময় তাঁর অবসর।'

—'আমি তো তাঁকে এই পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছি।'

—'স্কুল থেকে এসে রাত দশটা-এগারটা, কোনোদিন বারটা অব্দি তিনি কথার মানুষ খুঁজতে থাকেন, আলাপ করতে চান, নিজেকে বড্ড একা বোধ করেন।'

—'বেশ, তো, দাবার আড্ডায় গেলেই পারেন।'

—'বাবা তো ইহজীবনে কোনোদিন তাসও খেলেন নি।'

—'এ-রকম অদ্ভুত লোককে বাধ্য হয়েই একা থাকতে হয়।'

—'বাঃ বাঃ তুমি এই রকম কথা বল, তাস-পাশার মজলিশ ছাড়া, মানুষের আনন্দ পাবার অন্য কোনো জায়গাই নেই এই পৃথিবীতে?'

—'যে লোক বাড়ির থেকে বেরুবে না, সমাজে মিশবে না, আন্তরিক কথাবার্তা বলবার জন্য বন্ধু-বান্ধব কী করে জুটবে তার।"

মা বললেন—'অর্থ সম্পদ নেই; প্রভুত্ব প্রতিপত্তি নেই, কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ নেই।'

—'না, তা নেই।'

—'এ-রকম ধরনের বোবা লোকের কাছে কে এসে বসবে বলো?'

—'না বড় একটা কারুর আসবার কথা নয় বটে।'

—'মাঝে-মাঝে দু-চারটি ছাত্র এসে টিক-টিক করে।'

—'হ্যাঁ তা দেখেছি।'

—'ক্বচিৎ দু-এক জন মাস্টার আসে। তাও যদি হেডমাস্টার হতেন; তাও তো নন তোমার বাবা।'

—'বাবার জীবনটাকে এ-রকমভাবে পর্যালোচনা করা চলে বটে কিন্তু আমি তার জীবনের অন্য রূপ দেখেছি।'

উদাসীন চোখ তুলে মা আমার দিকে তাকালেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম, কেমন বেদনা বোধ করছিলাম।

—'কোনো অপূর্ব রূপ তোমার চোখে পড়ল?'

—'তোমার চোখেও পড়েছে নিশ্চয় এক দিন, যখন তিনি মরে যাবেন তখন বুঝতে পারবে।'

মা—'ছি, এমন কামনা করো তুমি? জেনো, আমার নোয়া-সিঁদুর এক দিন ঘুচে যাবে এই কথা আমাকে শুনিয়ে বলবার প্রবৃত্তি তোমার সংযম মানে না?'

—'বাবার জীবনী বা চরিত্রের কথা বিশদভাবে তোমাকে বলতে যাচ্ছি না, তোমাকে বলার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু দেখে না-দেখেও সবই জান তুমি। আজকালকার নানারকম নবীন-তরুণ মানুষদের মধ্যে তিনি এমন একজন সাবেকি লোক, যিনি চলে গেলে আমাদের পরিবারের শাখায়-প্রশাখায় কেউ কোথাও তার স্থান পূর্ণ করতে পারবে না।'

—'আবার তুমি সেই কথাই বলছ; নোয়া-সিঁদুর নিয়ে তার পায়ে মাথা রেখে আমি মরব।'

—'পায় মাথা রাখবার দরকার নেই—দিনের মধ্যে কয়েকবার অন্তত তার মাথার কাছে এসে বসো।'

—'যাই।'

—'কোথায়?'

—'লুচি করতে হবে। তোমার মেজকাকার জন্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা এত তাড়া কী? এখন তো মোটে দুটো।'

—'উদ্যোগ করতে হবে তো।'

—'না হয় একটু দেরিই হয়ে গেল আজ; বলো হেমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু বিলম্ব হয়ে গেল; কিছু বলবেন না তিনি।'

—'না, আমার একটু এখন দক্ষিণের ঘরে যেতে হবে।'

—'কেন?'

—'তোমার মেজকাকা বলেন, দুপুরটা বড্ড একা লাগে।'

—'তাই না কি?'

—'সান্নিধ্য তিনি বড় একটা ভালবাসেন না।'

—'পিসিমা ওখানে আছেন?'

—'হ্যাঁ আছে। ওর বকবকানি মেজবাবুর চক্ষুশূল।'

—'মেজকাকা জেগে আছেন এখনো?'

—'আছেন বই কি; সারা দুপুরই কি মানুষ ঘুমোয়?'

—'কী করেন সমস্তটা দুপুরবেলা?'

—'কীই-বা করবেন, তাই তো বলছিলেন, বড্ড একা লাগে, সময় কাটতে চায় না; তুমি এসো বড় বৌ।'

—'বাবা তোমাকে বড় বৌ বলে ডাকেন না।'

মা একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন।

—'কিংবা কাছে এসে বসতেও বলেন না?'

—'বুড়ো বয়সে কাণ্ডজ্ঞান হারান নি তো'—

—'স্কুল থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন, খুকিকে আদর করেন, কোলে নেন, খুকির সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা অভাব ঘুচতে চায় না, বুঝি অনেক কথা বলবার আছে তাঁর, তিনি অনেক বিনিময়ের মানুষ, আমার কাছে সমস্ত কথা ব্যক্ত করবার তাঁর সুযোগ নেই—অধিকার নেই, নির্দেশ নেই। আর্টিস্ট নন তিনি, লিখে নিজেকে নির্মুক্ত করে নেবার অবসর নেই। সামাজিক লোক নন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে নিজের বোঝা হালকা খালাশ করে নেবার সৌভাগ্যও নেই। ঘুরে ফিরে আমার কাছেই আসেন। বিছানার অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকেন অনেকক্ষণ, চেয়ারে গিয়ে বসেন, বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে থাকেন, আমার কোঠায় এসে আবার উঁকি দিয়ে যান, দু-চার মিনিটের জন্য আলো জ্বালেন, আলো নিভিয়ে ফেলেন। তারপর আবার চলে অন্ধকারের মধ্যে পায়চারি—এ-কোঠায়, ও-কোঠায় সে-কোঠায়—বারান্দায়, এ যেন আর ইহকালেও ফুরুবে না, নিজের কোঠায়—চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। দক্ষিণের ঘরে পিসিমা, মেজকাকা ও তোমার হাসি—তামাশার কোলাহল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পাই আমরা—কিন্তু এ-ঘরটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কল্যাণী তার কোঠায়, আমি আমার কোঠায়, বাবা নিজের কোঠায়। জীবনের হাসি-আনন্দকে আমরা কেইউ অপছন্দ করি না, কিন্তু পরস্পর এত কাছে থেকেও সে জিনিস আয়ত্ত করবার অধিকার আমাদের নেই, অনেক রাত বসে খবরের কাগজটা চিবিয়ে-চিবিয়ে শেষ করি, তারপর আবার চিবোই, তারপর আবার চিবোই। বাবা থেকে-থেকে উপনিষদের শ্লোক আওড়ান, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন—কল্যাণী তেঁতুলের ঝোল খেয়ে সন্ধ্যারাতেই বাতি নিভিয়ে জীবনের ক্ষমাহীন জীবনস্রোতের কথা ভাবতে থাকে।

মা—'এই জন্যই তো এই ঘরে আসতে চাই না; এ নিরানন্দের মধ্যে এসে অন্ধকারের ভিতর মুখ গুঁজে কাঁদব—'

—'কিন্তু এটাই তো তোমার ঘর—'

—'সেইজন্যই তো ঘুমোবার সময় এ ঘরে আসি।'

—'আমার ও কল্যাণীর কথা আলাদা। মানুষের জীবনকে তুমিও স্বীকার করেছ, বাবাও স্বীকার করেছেন, তোমাদের বিশ্বাস আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, তোমরা প্রার্থনা কর; অথচ তার এক মুহূর্ত আগেও অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক মানুষদের সঙ্গে অবান্তর কথা বল—অথচ তুমি ঘুমোবার সময় এ-ঘরে আসতে চাও শুধু, বাবা না-ঘুমিয়ে ঘুরে মরেন, বুঝি না এ কেমন?'

—'এক দিন বুঝবে; তুমিই তো এক দিন আমাকে চিতায় নিয়ে চড়াবে, সে দিন আমার কপালের সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারবে সব।'

—'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে শাড়ি-সিঁদুরের আড়ম্বরের কোনো মূল্য দেই না আমি; হয় ত সিঁদুরের দিকে তাকাবই না; জীবনে কে কাকে কেমন আঘাত করেছে সেই কথাই মনে হবে।'

—'যাক, তোমার সঙ্গে মিছিমিছি কথা বলবার কোনো অভিরুচি নেই আমার।'

মা চুলের ভিতর ধীরে-ধীরে চিরুনি নাড়ছিলেন।

—'পৃথিবীতে যদি অনেক দিন বেঁচে থাকতে হয় তা হলে সৎচরিত্র ধার্মিক আদর্শ গৃহস্থ হয়ে যেন জীবনটা না কাটাই—তার চেয়ে তাড়িখানাও ঢের ভাল।'

—'তোমার যা মনে আসছে, তা বলছ দেখছি হেম।'

—'বাবার মত সত্তর-বাহাত্তর বছর যদি বেঁচে থাকতে হয়—কবিতা লিখবার শক্তি যদি হারিয়ে ফেলি, তা হলে, তা হলে চীনাদের মত জুয়ার আড্ডায় কাটাব। কিংবা জাহাজের খালাশি হয়ে বেরিয়ে যাব, মিছিমিছি বাবার মত উঠানে বারান্দায় অন্ধকারে পায়চারি করে শিষ্ট সাধু হয়ে জীবনের সম্ভাবনাটাকে নষ্ট করে কী লাভ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজকাকাও করেন না, সেজকাকাও করেন না; প্রতি মুহূর্তেই জীবনের কাছ থেকে নতুন কিছু পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনায় থাকেন।'

ভিজে শালিকের ঘাড়ের পালকের মত চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল মার, শাড়ি বদলাতে গেলেন, ফিরে এসে খুকির মাথায় দু-তিন বার হাত বুলিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে চলে গেলেন। রাত বারটা-একটার আগে এ ঘরে আর পদধ্বনি শোনা যাবে না।

বাবা চমকে উঠে—'কে?'

—'আমি'

—'ও, হেম?'

—'হ্যাঁ'

—'রাত কটা বাজে?'

—'এই দশটা হবে।'

—'ওঃ তবে তো কম রাত হয় নি—কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আরো ঢের বেশি রাত হয়েছে, এই বারটা আন্দাজ,' একটু হেসে, 'অবিশ্যি, আমার মনের ঘড়ি অনুসারে রাত একটা-দুটো হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে; কিন্তু তুমি খেয়েছ?'

—'হ্যাঁ অনেকক্ষণ, আপনি খেলেন না কিছু?'

—'এক গ্লাস মিছরির পানা খেয়েছি, আজ আর খাব না।'

—'কিছুই না?'

—'না', একটু চুপ থেকে, 'মাঝে-মাঝে উপোস দেওয়া দরকার; তাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না, ভালই হয়, খুকি ঘুমিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দুধ খেয়েছিল?'

—'খেয়েছে।'

—'তোমার বিছানায় নিয়েছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'খুকির আবার পাঁচড়া হচ্ছে দেখলাম।'

—'হ্যাঁ।'

—'সমস্ত হাত-পা, বুক-পিঠ, খুজলিতে ভরে গিয়েছে।'

—'দেখেছি।'

—'এ তো বড় ভাল কথা নয়।'

—'নাঃ ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে।'

—'কিন্তু বার-বার এ-রকম পাঁচড়া হয় কেন? এই আড়াই বছরের মধ্যে তিন বার হল?'

মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

—'কলকাতায় তুমি চৌদ্দ বছর ধরে আনাগোনা করছ, কখনো কোনো প্রলোভনে পড়ো নি তো? শরীরে কোনো রোগ আছে তোমার?'

—'আছে বলে তো জানি না'

—'এ মেয়ের প্রতি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পেরেছ বলে মনে হয় না।'

নিস্তব্ধতায় খানিকটা সময় কেটে গেল।

একটু চুপ থেকে—'থাক, এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি ঘুমোতে যাবে এখন?'

—'না।'

—'পড়বে?'

—'এখন আব পড়ব না।'

—'ভবিষ্যতে আর—'

কিন্তু না-বলে থামলেন।

বললেন—'অবিনাশকে কাল ডেকে আনব।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি তো অ্যাসিসট্যান্ট সারজেন—'

—'ভিজিট দেব, বেশ পাকা ডাক্তার, খুব অমায়িক, ভদ্র মানুষ।'

—'কিসের জন্য আনবে তাকে বাবা?'

—'খুকিকে দেখবে, তাঁকে খুলে সব বলো।'

চুপ করে ছিলাম।

—'আর তোমারও ব্লাড এক্সামিন করবে। ওষুধ দেবে, হয় ত ইনজেকশান-এর দরকার হবে।'

একটু বিব্রত হয়ে—'কিন্তু মেজকাকা যদ্দিন এ বাড়িতে আছেন এখানে অবিনাশ বাবুকে না আনাই ভাল।'

—'কেন সুরেশ কোনোদিন এর জন্য ইনজেকশান নেয় নি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

মাথা হেঁট করে—'নিলে তো প্রকাশ্যে নেয় নি।'

বাবা—'বছর পনের আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সুরেশের বাসায় কয়েকদিন ছিলাম; গামছা ছিল না, সুরেশ এক দিন আমাকে তার টার্কিশ তোয়ালেটা দিয়ে বললে, দেখবেন দাদা, এ গামছায় চোখ-মুখ মুছে অন্ধ হয়ে যাবেন না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ-রকম বলছ? বললে, ডাক্তারের নিষেধ আছে, ছেলেপিলেদের দেই না আমার ব্যবহৃত জিনিস, কারুরই ধরবার উপায় নেই। খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললাম, ডাক্তারের এ রকম নিষেধ কেন? সুরেশ বললে, কামনাই বলুন প্রেমই বলুন, সে-সব জিনিসের তাড়া আমার বড্ড বেশি; কাজেই ডাক্তার, লোশন, অনেক কিছুই লাগে। কিন্তু তবুও গামছার এই দুদর্শা; পাশেই ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছিল তামাশা পেয়ে হাসতে লাগল। রমেশের মতিগতিও এই রকম। এই পরিবারটা যেন একটা অসুরের। অবাক হয়ে ভাবি, বাবা এমন দেবতার মতন মানুষ ছিলেন অথচ এই রকম হল কী করে।'

একটু চুপ থেকে, 'আজও সুরেশ রোজ সন্ধ্যায় ইনজেকশান করে বেরোয়।'

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'রাত্রে ফিরে এসে, ইনজেকশান করে আবার।'

—'তাই না কি?'

—'নিজেই আমাকে বলে; বলে জীবন এনজয় করছি।'

দু'জনেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; আকাশে মেঘের ঘন গভীর আয়োজন, পেয়ারা গাছে বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি, পশ্চিম দিকের মাঠে একটা বিড়ালছানার অবিশ্রাম কান্না—আমার কোঠার থেকে খুকির শান্ত নিশ্বাস।

আরো অনেকটা সময় কেটে গেল।

বিড়ালের ছানার কান্না থেমে গেলে বাবাকে—'যাক, তুবও খুকিকে নিয়ে যাব আমি।'

—'অবিনাশ বাবুর কাছে?'

—'হ্যাঁ; তিনি এখানে না এলেই ভাল।'

—'তা বেশ তবুও ব্লাড দেখিয়ে এসো।'

—'তা দেখালেও হয়, না দেখালেও হয়।'

—'কেন?'

—'আমার মনে হয়, শরীরে আমার কোনো রোগ নেই।'

—'নেই?'

—'না, আমার বোধ হয়, পেট পরিষ্কার না হয়ে খুকির এই রকম পাঁচড়া হচ্ছে।' একটু চুপ থেকে—'অবশ্য কলকাতায় এ চৌদ্দ বছর যে খুব সুষ্ঠুভাবে কাটিয়েছি তা নয়।'

—'আচ্ছা বেশ।'

—'দৈন্য নানাভাবেই এসেছে।'

—'একটা বিড়ালের ছানা কাঁদছে না।'

—'হ্যাঁ'

—'কোথায়?'

—'পশ্চিম দিকের মাঠে বোধ করি।'

—'নিয়ে এলে হয় না?'

—'ছানাটাকে এনে কোথায় রাখবে?'

—'আমার এই কোঠায় রাখতে পার, ঐ যে বেতের বড় ঝুড়িটা আছে ওরই ভিতর কয়েক টুকরো ন্যাকড়া রেখে শুইয়ে দিলে হয় তো।'

—'কিন্তু কোনো এক জায়গায় তিষ্ঠবে না যে, ঘুরে-ঘুরে কাঁদবে।'

—'কেন?'

—'হয় তো মাকে খুঁজছে।'

—'মা-ইবা ওর আসে না কেন?'

—'সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বিধাতা জানেন; বেঁচে থাকলে হয় ত দু-দশটা মাঠ পেরিয়ে। সারা গায়ে উনানের কালি মাখিয়ে। শূন্য ভাতের হাড়ির পাশে বসে জীবনের প্রবঞ্চনার কথা ভাবছে।'

—'আমি আর তোমার মা, তুমি আর কল্যাণী পরস্পরের আরো ঢের কাছে; কিন্তু আমাদের অবস্থাও অনেকটা এই রকম, কী বল হেম?'

টিটকারি দিয়ে বাবা একটু হাসলেন।

পরক্ষণেই—'না, তা নয়, ঐ ছানটার বেদনা যে কী গভীর তা আমরা ধারণাও করতে পারি না।'

বিছানার থেকে নেমে এসে টেবিলের লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিলেন।

বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'দেখি, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসি।'

—'কিন্তু আনতে তো কেঁদেকেটে একাকার করবে!'

—'তা করুক, তবুও আশ্রয় পাবে তো।'

—'এ ঘরে কারো যে ঘুম হবে না তা হলে; মা আর কল্যাণী হয় ত বিরক্ত হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লণ্ঠনটা দু-তিনবার দুলিয়ে-দুলিয়ে বাবা—'একটু গরম দুধ দিলে হয় ত কান্না থামবে বাচ্চাটার।'

—'দুধ এত রাত্রে কোথায় পাব?'

—'আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এসো দেখি।'

দক্ষিণের ঘরের থেকে ফিরে এসে বললাম—'না, দুধ নেই।' ছানাটার কান্নাও আর শোনা যাচ্ছিল না, খুব চেপে জল এল। জীবনের গভীর উদাসীনতা আমাদের পেয়ে বসল। সৃষ্টির ক্ষমাহীনতার রহস্যময় উপেক্ষার সাথে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে অন্ধকারের ভিতর মাথা গুঁজে দু'জনে ঝিমুতে লাগলাম। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমের ভিতর বিড়ালছানার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, মানুষের নড়াচড়ার শব্দ ধীরে-ধীরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ছানাটাকে কোলে করে চুপচাপ বসে আছেন চোখ বুঁজে।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পৃথিবী সব সময়ই কি বাস্তবিক অন্ধস্রোতে চলে? নিশ্চিত বেদনা, নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর সমুদ্রই কি জীবনকে ঘিরে রয়েছে?

তা নয় হয় তো, অন্তত আবিষ্কারের জায়গা আছে, হয় তো আমারও।

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গেলাম; এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তা হলে? কোথাও বিড়ালের ছানা নেই. আলো নেই, কিছু নেই, বাবার স্থূল নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারদিকে অন্ধকার শ্রাবণের বাদল ও বাতাসের বীভৎস আমোদ-টিটকারি এতক্ষণে জমল তা হলে?

আরো দুপুর রাতে, রাত তখন প্রায় দুটো-আড়াইটে হবে মনে হল, কল্যাণীর ঘরে আলো জ্বলছে, ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসলাম—হ্যাঁ আলোই জ্বলছে।

এত রাতে আলো জ্বালিয়ে কেন?

বরাবরই বাতি নিভিয়ে ঘুমোবার অভ্যাস।

মিনিট পনের বিছানার উপর বসেছিলাম, দেখলাম আলো নিভছেও না, কারুর কোনো সাড়া-শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। কল্যাণী, বা কোনো মানুষ, যে ও-ঘরে আছে তাই বোধ হয় না। আস্তে-আস্তে খুকিকে শুইতে দিয়ে, বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে, চটির মধ্যে আস্তে-আস্তে পা ঢুকিয়ে কল্যাণীর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিছানার এক পাশে, একখানা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর লণ্ঠনটা রেখে চুপচাপ বসে আছে। সামনে তিনটে জানলাই খোলা, যতদূর দৃষ্টি যায় কতকগুলো বড়-বড় তাল গাছ, তেঁতুল, হিজল, আম, অশ্বত্থ, বাঁশ, ধানক্ষেত, আরো অনেক দূর গ্রামের প্রান্তর ও শ্মশান।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণী—'তুমি এসেছ, ভাল করেছ।'

একটু হেসে বললে—'ভাবছিলাম, আমি তোমাকে ডাকব।'

বিছানার এক কিনার দেখিয়ে দিয়ে—'বসো।'

একটা টিনের চেয়ার ছিল, সেইটে টেনেই বসলাম।

—'কেন, বিছানায় বসতে দোষ কী? আলো দেখে চলে এসেছ? না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, তা হলে তো ঘুমোও নি।'

—'ঘুমিয়েছিলাম।'

—'তবে কিছুক্ষণ হল জেগেছ। কেন জাগলে? রাত এখন কটা?'

—'আড়াইটা।'

—'এই সময়ে জেগে উঠলে, কী মনে করে?'

—'এমনি, হয় ত মশার কামড় খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

—'মশারি ফেলে শোও নি বুঝি?'

—'না, এই মাত্র ফেলে দিয়ে এলাম।'

—'খুকি ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেচারা! আমাকে যে ও পেয়েছে, বোঝা হল না। মনে করো, মাতৃহীন হয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

—'অনেক শিশুই তো আসে। তা নিয়ে এত চোখ ছলছল করবার দরকার কী?'

—'চোখ ছলছল করছে বুঝি আমার?' আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে কল্যাণী—'তুমি না এলে তোমাকে কিন্তু আমি ডাকতে পারতাম না!'

—'তা আমি জানি।'

—'সত্যি জানো না কি? আমার মান-অপমানবোধ বাস্তবিক কিন্তু খুব বেশি।'

আঁচলের খুঁটে আবার চোখ মুছে—'তুমি আমাকে অপমান কর নি বটে, কিন্তু এত রাতে তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে ডাকব—জীবনের মধ্যে আমার না আছে সেই প্রীতি, না আছে তেমন আবেগ।'

একটু চুপ থেকে—'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে-নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তা হলে হয় ত উপলব্ধি করতে পারবে যে লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনোদিনই কিছু যেন পাও নি'—

পকেটের থেকে একটা সিগারেট বের করে—'জ্বালাব?'

—'হ্যাঁ, জ্বালাতে পারো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'দেশলাই কোথায়?'

—'আমার বালিশের নিচেই আছে—দিচ্ছি।'

দেশলাই হাতে নিয়ে বললাম—'এত রাতে বাতি জ্বালালে যে?'

—'ঘুম আসছিল না।'

—'কেন, কী হয়েছে?'

—'না, হয় নি বিশেষ কিছু।'

—'আজ ভাত খেয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী দিয়ে?'

—'তোমরা যা দিয়ে খেয়েছ।'

—'দু-এক-দিনের মধ্যে আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি যাতে মনে আঘাত লাগতে পারে? এমন কিছু বলেছি বা করেছি বলে মনে তো পড়ছে না, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যদি বেদনা দিয়ে থাকি—'

—'না, তুমি তো কোনো বেদনা দাও নি আমাকে, কিছু বল নি; তিন-চার দিন ধরে আমাদের মধ্যে কথাই তো হয় নি।'

—'তিন-চার দিন কথা হয় নি? কেন, কল্যাণী?

—'এই বর্ষা—বাদলের মধ্যে মাঝে-মাঝে এই রকমই হয়; শুয়ে, ঘুমিয়ে, নিজেদের ভাবে থেকে দিনের পর দিন এমনিভাবেই কেটে যায়।'

সিগারেটটা পকেটে রেখে দিলাম।'

কল্যাণী—'তা ছাড়া আমার রুচি বুদ্ধিকে খুব শ্রদ্ধা কর তুমি?'

একটু হেসে—'কী করম?'

—'তুমি জান, মাঝে-মাঝে আমি চিঠি লিখে ডায়েরি লিখে নিজেকে নিয়ে একটু থাকতে চাই; এ-সময়ে আমার কাছে কেউ আসে তা আমার ভাল লাগে না, এ সব জান তুমি; অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হিতাকাঙ্ক্ষীর মত দূরে সরে থাক, এক মুহূর্তের জন্যও বাধা দিতে আস না। এ জন্য শ্রদ্ধা করি আমি তোমাকে।'

দেশলাইটা রেখে দিলাম।

কল্যাণী—'কিন্তু চলে যেতে হবে আমাকে কাল।'

—'কাল?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

—'এমন বিশেষ কোথাও না। আলমোড়া-মুসুরি পাহাড়ে নয়, যাব আমি,' একটু থেমে-থেমে—'মেদিনীপুরের একটি পাড়াগাঁয়ে।'

—'কেন?'

—'দরকার আছে।'

—' মেদিনীপুরে তোমার কে আছেন?'

—'আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

—'সেই?'

—'না, হেমন্তবাবু আছেন আর তাঁর স্ত্রী।'

—'কে তাঁরা?'

—'চিনবে না, সেই বাসাতেই যাব। আজ বিকেলে একটা চিঠি এসেছে।'

—'হেমন্তবাবুর?'

—'না, তাঁর স্ত্রীর।'

—'তোমাকে যেতে লিখেছেন?'

—'যেতে অবিশ্যি আমাকে লেখেন নি, কী ভরসায় যেতে লিখবেন! তারা অত্যন্ত ভদ্রমানুষ—নিজেরা সংসার করছেন, পরের সংসারের উপর তাঁদের সহানুভূতি আছে।'

—'তবে তুমিই বুঝি যাওয়া ঠিক করলে?'

—'হ্যাঁ, একটি মানুষ মরছে—তার মৃত্যুশয্যায় তার কাছে আমি না থাকলে চলবে না।'

বলে, কল্যাণী চোখে আঁচল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ পর—চোখ মুছতে-মুছতে, 'থাইসিসের রোগী মেদিনীপুরের একটা গ্রামে পড়ে আছে এই বর্ষা বাদলের সময়ে।'

—'বড্ড খারাপ কথা—কেন, বাপ-মা নেই তার?'

—নির্মলদার? কিছু নেই। আমার উপরেই তার সব নির্ভর করে—'

—'নির্মলদা?'

—'হ্যাঁ'

প্রায় পনের বছর ধরে মুখ চেয়ে থাকার মত একটু বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, কে কার মুখ চেয়ে থেকেছে পনের বছর? কল্যাণী নির্মলের? না নির্মল কল্যাণীর? প্রয়োজন মত অস্পষ্টতা দিয়ে এই সম্পর্কে নিজের বক্তব্যটুকুকে বেশ আবরণ দিয়ে রেখেছে কল্যাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হেমন্তবাবুদের কিছু হন না কি?'

—'কে? নির্মলদা? কিছু না, ওরা ভদ্রস্থ মানুষ, দয়া করে তাকে স্থান দিয়েছেন।'

—'তা নির্মলের এই রকম অবস্থা কেন? পৃথিবীতে সে একেবারেই একা বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ-রকম হল কেন? ইতিহাস কী?'

—'দু'জন কাকা আছেন বুঝি, তবে তারা ওর কোনো খোঁজ খবর নেন না। ম্যাট্রিক পাস করেই স্বদেশী করে জেলে যায়।'

—'কে? নির্মল?'

—'হ্যাঁ, সেই থেকেই জেলেই এক-রকম। এক সময় জেলের থেকে বেরিয়ে চামড়া ট্যানিং শিখবার চেষ্টা করেছিল।'

—'তা শিখল না যে?'

—'টাকা নেই, কড়ি নেই, স্বদেশীর দিকে ঝোঁক, কোনো একটা মার্কেট থেকে ধরে নিয়ে গেল।'

—'তোমার সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'

—'আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই ওরা থাকত।'

—'কোথায়?'

—'তখন আমরা মানভূমে ছিলাম। মানভূমে প্রায় দশ বছর থাকা, তার পর বাবা বাগনানে এলেন—বছর দুই-তিন পরে কালীঘাটে একটা বাসা ভাড়া করে ছিলেন—সেইখানেই বাবা মারা যান। সেই রাত্রে যে—'

কল্যাণী জানলার দিকে তাকিয়ে—'তা হলে কালই যাব আমি।'

—'তা যেও; দুখের বিষয় তোমার কোনো টাকাকড়ি নেই।'

—'আমার গয়নার বাক্স সঙ্গে নেব, কলকাতায় বিক্রি করে নেব।'

—'কার সঙ্গে যাবে?'

—'তুমি দিয়ে আসতে পারবে না?'

একটু চিন্তা করে—'রবিকে যদি দেই তা হলে হবে না?'

—'রবি ঠাকুরপোকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হলে তো বেশ ভালই হবে, আমার মনে হয় তোমার না—যওয়াই ভাল, আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে উঠব, তাতে নির্মলদা আঘাত পাবে। মিছিমিছি তাকে অযথা কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তাকে দুঃখ দেবার জন্য যাচ্ছি না তো আমি।'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'যাতে উৎসাহ পায়, ভরসা বোধ করে, জীবনের সম্বন্ধে আশা ফিরে আসে, আলো-বাতাস ভাল লাগে, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হয়, সেইজন্যই তো যাওয়া।'

বলে বালিশে মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কল্যাণী। উঠল যখন, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

বললে—'তুমি এখনো বসে আছ?'

—'হ্যাঁ গোটা তিনেক সিগারেট খেলাম বসে।'

—'তাই না কি?'

—'টেরও পাওনি বুঝি?'

—'না তো!'

—'এক-এক সময় মানুষের মন বড় অপার্থিব হয়ে পড়ে কল্যাণী, পৃথিবীর স্থূল সামান্য কদর্য জিনিসগুলো সম্বন্ধে খেয়ালও থাকে না—মন থাকে জীবনের মহামূল্য মহিমাময় জায়গায় বিচরণ করতে।'

মাথা কাত করে ধীরে-ধীরে কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিচ্ছিল কল্যাণী, চোখ জানলার ভিতর দিয়ে—দূর প্রান্তরের দিকে, কখনো দু-তিনটি নক্ষত্রের পানে।

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

আমি যদি যক্ষ্মায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সেও কী শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?

না, তা আসবে না, এমন কোনো নারী নেই যে তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

কোনো রূপ নেই, রং নেই, রীতি নেই—কিছুই ঘটে না জীবনে।

আকাশ পরিষ্কার ছিল, ভোরবেলা একটু বেড়িয়ে এলাম। বেশ রোদ, আকাশ চমৎকার নীল! শরৎ আসে নি, তবে কাশ এসেছে।

বেশি দেরি করলাম না, তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে ফিরলাম। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম কল্যাণী চা নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে বললাম—'কোথায় চা পেলে?'

—'কেন, বাবা তো অনেক দিন হয় তোমার জন্য চা কিনে রেখেছেন।'

—'ওঃ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কাছেই রেখেছিলাম—কিন্তু এদ্দিন তোমাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি।'

দেখলাম, বেশ দেখে-শুনে বিচার-সহানুভূতি দিয়ে চা করেছে। চা খাওয়ার পরে একটা ঝাঁটা নিয়ে এল, বললে—' তোমার ঘরটা যে কী হয়ে আছে, ভাল করে ঝাঁটও দেয় না কেউ।' অনেকক্ষণ বসে বেশ দরদের সঙ্গে ঝাঁট দিলে, কোণায় যেখানে যা ময়লা ছিল দেখলাম সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আমার বইয়ের তাকটা গুছিয়ে দিল। আমার টেবিলট গোছাল। মাঝে-মাঝে এসে হাসিমুখে খুকিকে নিয়ে আদর করা, আমাকে মিষ্টি করে কথা বলা—কল্যাণীর এ-বড় গভীর রূপান্তর।

যে-সব জামা-কাপড় ছিঁড়ে ছিল, বোতাম ছিল না, অনেকক্ষণ বসে সেলাই করে দিল।

এক সের আন্দাজ বাংলা সাবান ও নোংরা কাপড়ের গাদি নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর এসে—'যাক, আমি যাব না।'

—'কোথায়? মেদিনীপুরে? কেন যাবে না?'

—'বছর তিন-চার নির্মলের দেখা নেই, কেমন যেন লজ্জা করে।'

—'রোগীর কাছে আবার লজ্জা-সঙ্কোচ কী কল্যাণী?'

—'কিন্তু সে তো আমাকে যেতে লেখে নি!'

—'কে? নির্মল? মৃত্যুশয্যার থেকে কী করে লিখবে?'

—'কিন্তু যারা লিখেছেন, তাঁরাও তো আমাকে যেতে লেখেন নি।'

—'তাঁরা মনে করেছেন, 'ও-রকম রোগের খবর পেলে তুমি নিজে থেকেই যাবে।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমার তো টাকাকড়ি নেই, শুধু হাতে গিয়ে কী লাভ!'

—'কেন গয়নার বাক্স নিয়ে যাবে—কলকাতায় বিক্রি করে নেবে।'

—'আহা! কেই-বা বিক্রি করে দেবে।'

—'কেন? রবি?'

—'রবি ছেলে মানুষ। সে কি আর পারবে?'

—'তুমি জান না কল্যাণী, রবি এ-বিষয়ে খুব ওস্তাদ, নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, তোমার চেয়ে ছ-সাত বছরের বড়, ব্যবসাদারের ছেলে।'

একটু থেমে—'তা, যদি তুমি তাই মনে করো, আমি এখানে থেকেই বিক্রি করে দিতে পারি।'

—'না, থাক, এখানে বিক্রি করে দরকার নেই, লোকে কী মনে করবে।'

—'কিংবা কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে গিয়ে—'

—'এই তো একমাত্র গয়নার বাক্স আমার সম্বল, কিন্তু গয়নাগুলো আজ যদি বিক্রি করে ফেলি, এক দিন অভাবের সময়?'

—'আজও তো কম অভাবের দিন নয়।'

—'কি রকম?'

—'নির্মলের মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাল চেঞ্জের জায়গায় যায় এমন সঙ্গতি নেই বেচারির—'

—'ভাল চেঞ্জের জায়গায় নিয়ে গেলে কিছু হয় কী? বলো?'

—'হ্যাঁ।'

—'শিমুলতলা, মধুপুর?'

—'কিংবা ধর্মপুর হতে পারে, ভাওয়ালি হতে পারে।'

—'সে ঢের টাকা লাগে তাতে।'

—'টাকা তো লাগবেই।'

—'তা ছাড়া আগের থেকে বেড-এর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। আমি মেয়ে-মানুষ কী করে এত সব পারব?'

—'হেমন্তবাবুদের সাথে পরামর্শ করবে, দরকার হলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'

—'মোটমাট সে ঢের টাকার দরকার, তোমারও কোনো চাকরি-বাকরি নেই, গয়না বিক্রি করলে চার-পাঁচ শ টাকা বড় জোর পাব।'

মাথা নেড়ে—'পাঁচ শ তো খুবই পাবে।'

—'কিন্তু খুকির কথাও তো ভাবতে হয়, মা হিসেবে তার উপর আমার দায়িত্ব রয়েছে।'

চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কল্যাণী—'গয়নার বাক্স তো আমারই জিনিস শুধু নয়—এ তো খুকির জিনিস। বেচারাকে বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার আমার আছে কি?'

—'গয়নাগুলো এ-রকম কাজে লাগিয়েছ, ভবিষ্যতে হয় তো এ কথা শুনে খুকি অপ্রসন্ন হবে না।'

—'কিন্তু যদি হয়?'

—'তা হলে তার অপ্রীতিকে উপেক্ষা করলে অধর্ম হবে না আমাদের।'

কল্যাণী, একটু ইতস্তত—'শুধু তো এই নয়, ভগবান না করুন—কিন্তু বাবা চলে গেলে আমাদের কটা দিন অনন্ত দাঁড়াতে হবে তো।'

তর্ক আর বহুদূর চালিয়ে লাভ নেই; এই গয়নার বাক্স সম্পর্কে পরাজয় মানবার ইচ্ছা এই নারীটির নেই।

বললাম—'গয়না বেচে টাকাকড়ি নাই-বা সঙ্গে নিলে, এমনিই যেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'শুধু হাতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত সময়-অসময় নির্মলের কত খরচ দরকার হবে; আমি একটা পয়সাও দিতে পারব না?'

—'তোমার বাবা যে তোমার জন্য কিছু রেখে যেতে পারেন নি সবাই তো তা জানে; তোমার শ্বশুরবাড়িরও কোনো সম্বল নেই।'

—'কিন্তু তাই বলে দুটো বেদানা কেনার জন্যও পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা!'

—'কুড়ি-পঁচিশ না হয় আমি জোগাড় করে দেব।'

কল্যাণী—'যক্ষ্মারোগীর কেউ কাছে আসে না। হেমন্তবাবুরা হয় তো সেবা করে-করে হয়রান হয়ে গেছেন, এখন সমস্ত সেবার ভার হয় তো পড়বে আমার ওপর।'

—'হ্যাঁ, টাকাকড়ি না থাকাতে যা পারলে না, সেবা দিয়ে তাই শুধরে দেবে। জীবনের এই দুঃসময়ে নির্মল বুঝবে যে, নারী, তার ভালবাসা কত আশীর্বাদের জিনিস।'

কল্যাণী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বললে—'কিন্তু আমি তো আজ একা নই। সংসারের পাকে জড়িয়ে গেছি যে। আমার দায়িত্ব আজ অনেক দিক দিয়ে। সংসারের বধূ আমি। আমি মা। কোনো একটা রোগ যদি বাধিয়ে আসি তা হলে খুকির কী হবে? তোমাদের এই সংসারের শান্তিও যাবে একেবারে নষ্ট হয়ে। ছেলেবেলার স্বপ্ন, খেলা, স্নেহ, ভালবাসা অবিশ্যি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু সজ্ঞানে হোক, অন্ধকারে হোক জীবনের পথে আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি যে শুধু আমার হৃদয়ের বিলাসের জন্য এতগুলো লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় হয়।'

একটু চুপ থেকে—'হরিচরণের কাণ্ড দেখেছ?'

—'কেন? কী করে? কই দেখি নি তো!'

—'কপালে চোখ থাকলে তো দেখবে? গাছের সমস্ত পেয়ারা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে।'

নিস্তব্ধ ছিলাম।

—'পেয়ারা চিবুতে ইচ্ছা করে না অনেক সময় মানুষের? কই? ওর কল্যাণে বাকি আছে কি কিছু?'

—'পেয়ারা গাছ তো তিন-চারটে।'

—'একটা গাছেও একটা কড়াও যদি থাকে! না পাওয়া যায় খাবার সময় একটা লেবু হাতড়ে? একটা জাহাঁবাজ চোর!'

—'লেবু হয়তো কাকার জন্য নিয়ে যায়।'

—'বাবাকে বলে দাও না কেন তুমি?'

—'কী বলে দেব?'

—'এই সব অনাচারের কথা।'

—'তা হলে মেদিনীপুরে তুমি আর যাবে না?'

—'উঁহু। সেদিন দেখলাম খুকুর দুধ চুমুক দিয়ে খাচ্ছে।'

—'কে?'

—'হরিচরণ, আর-কে? রাতেরবেলা আবার ডিবে ভরে-ভরে কেরোসিন নিয়ে পালায়।'

মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে যক্ষ্মা রুগীর সন্ধানে সে গেল না আর।

পানের বাটার কাছে বসে ধীরে-ধীরে আট-দশটা পান তৈরি করল, চিবুল-ডিবের মধ্যে ভরে নিল। তার পর ভাল করে সিঁথিপাটি করে টকটকে লাল পাড়ের একটা সুন্দর ধোপদুরস্ত শাড়ি বের করে সেজেগুজে পাড়ায় বিন্তি খেলাতে চলে গেল।

হয় ত বনলতাও আজ এই রকম।

দুপুরবেলা প্রায় আড়াইটের সময় মা ঘরে শুতে এলেন।

আমি—'ঘুমোবে না কি?'

—'হ্যাঁ একটু জিরিয়ে নেই।'

—'তোমার খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ হল?'

খাটে বিছানো মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে—'এই প্রায় আধ ঘণ্টা আগে।'

—'আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়েছ তা হলে? বিনা বালিশে শুয়ে পড়লে যে?'

—'বালিশটার তুলো বেরিয়ে গেছে।'

—'আমার বালিশটা এনে দেই?'

—'কেন এই তো তোশকে মাথা দিয়ে শুয়েছি।'

বলে, মাথা তুলে ভাঁজ করা তোশকের উপর রাখলেন।

—'দক্ষিণের ঘরে আজ যে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

—'ওরা ঘুমিয়েছে সব।'

একটু হেসে—'তাই আমি ভাবছিলাম।'

—'কী ভাবছিলে হেম?'

—'ভাবছিলাম বৃষ্টি পেয়ে বেশ আরামে ঘুমুচ্ছে—মার আজ আর কথাবার্তা বলবার লোক নেই।'

—'একটা বাংলা গল্পের বই দিতে পারো হেম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নেই কিছু।'

—'তা হলে ঘুমনো যাক।'

—'আমি ভাবছি দু-চার দিনের মধ্যে কলকাতায় যাব'

—'তা গেলেই পারো।'

—'টাকা জোগাড় করেছেন বাবা, কিন্তু গিয়ে কী করব সে বুঝে উঠতে পারি না, এই ছ-সাত বছর যত চেষ্টা করেছি তাতে মানুষ লাটসাহেব হয়ে যায়, আমি হয়ে গেছি পোড়া কাঠ। এখন কলকাতায় মানে একটা থাইসিস-টাইসিস কিছু তৈরি করে বাড়ি ফিরে আসা।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'যদি যক্ষ্মা নিয়ে আসি তা হলে তোমরা কী করবে?'

—'উঠোনের এককোণে একটা আটচালা তুলে দেবেন তোমার বাবা, সেইখানে তোমার বৌকে নিয়ে থাকবে।'

—'যক্ষ্মা হলে?'

—'হ্যাঁ; আমরা জোগাড় ওষুধ পথ্য আর বৌমার কাছ থেকে দিন-রাত সেবা পাবে। না—সেটুকু ভরসাও তার কাছ থেকে নেই।'

—'সেবা বরং তুমিই করবে; নাঃ, কলকাতায় আজকাল বড্ড যক্ষ্মা হচ্ছে। আমার যদি হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'বয়স বেড়ে গেছে, চাকরি নেই, শরীরের ধাত চিরকালই খারাপ; টিকটিক করে মনটা ছিল, সেও গেছে যেন ছিঁড়ে টুকরো হয়ে। তার পর দিনরাত কলকাতার পথে-পথে ঘোরা। শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টি ও রোদ। মেস-এর যাচ্ছেতাই খাওয়া। এই বয়সে এ-রকম মনমরা হৃদয় নিয়ে দেখি রোজই অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছে?'

মা—'মেসে কী খেতে দেয়?'

—'তা তো তুমি জানোই।'

—'আমাদের বাড়ির চেয়েও খারাপ?'

—'আমরা অন্তত ভাল ডাল পাই আর খানিকটা দুধ।'

—'ওখানে দুধ দেয় না ভাতের সঙ্গে?'

—'দুধ খেতে হলে পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয়।'

—'অল্প-অল্প জ্বর হয় না কি তোমার?'

—'না, তবে মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন শরীর গরম হয়েছে—কেমন অরুচি হয়, কিছু ভাল লাগে না। একটা থার্মোমিটার থাকলে দেখা যেত কী রকম টেম্পারেচার হয়, একটা চার্ট তৈরি করতে পারতাম।'

—'জ্বর-জ্বর বোধ করলে কী করো তখন?'

—'বিছানায় শুয়ে থাকি, আর ভাবি, ভগবান, আর যাই হোক, টি-বি-র বীজ শরীরের থেকে না বেরোয়।'

—'একটা থার্মোমিটার কিনলে পার?'

—কিনব-কিনব করে আর হয়ে ওঠে না।'

—'ডাক্তার দেখালেই পার।'

মাথা নেড়ে—'হয় তো বলে দেবে স্পুটামের মধ্যে যক্ষ্মার বীজ, তখন কী উপায়?

—'তা বলবে কেন; যক্ষ্মা তোমার হয়নি' কেনই-বা হবে? তোমার বাবা তো সত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে আছেন, আমিও তো এত জলঝড়ে ভিজি, কিছু হয় না, আমার মনে হয় ডাক্তার দেখিয়ে খানিকটা কুইনিন খেলে ঠিক হয়, কিংবা একটা মিক্সচার।'

—'এবার গিয়ে স্পুটাম পরীক্ষা করাব ভাবছি।'

মা চুপ করেছিলেন।

—'রক্তও পরীক্ষা করাব।'

—'মিছিমিছি টাকা খরচ করবি কেন? তোর মেজকাকার সঙ্গে অনেক ভাল ডাক্তারের জানাশোনা আছে। বিনি পয়সায় করিয়ে দেবে।'

—'কী দরকার, কতই-বা আর নেবে?'

—'আচ্ছা, আমি না হয় সুরেশবাবুকে বলব আজ, তিনি খুব খুশি হয়েই রাজি হবেন।'

—'না, থাক, বলতে যেও না।'

—'সঙ্কোচ করছিস কেন হেম? আমি তো খুব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।'

একটু চুপ থেকে—'অন্তত আজ তুমি বলতে যেও না, দু-তিনটে দিন ভেবে দেখি।'

—'বেশ, এখানে তুমি তো ক-দিন আছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'উনিও আছেন ক-দিন।'

একটু চুপ থেকে—'দেখাতে হলে এখানকার অবিনাশবাবুকেও তো দেখাতে পারি। মথুরবাবুও আছেন। এ তিন মাস এখানেই থেকে একটু ভালই বোধ করছি; হজমের গোলমাল তেমন হয় না, রাতেও ঘুম হয়।'

—'সুরেশবাবুও বললেন—বেশ ঘুম হচ্ছে তার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—পেটের গোলমাল হয় মেজকাকার?'

—'না, তাও হয় না।'

—'খান তো মন্দ না!'

—'তবে কলকাতায় যে ঢের কম খান।'

—'কী সব ওষুধও খান বোধ করি খাবার পর?'

—'কয়েকদিন থেকে সোডা ওয়াটার আনছেন।'

একটু চুপ থেকে—'সোডা ওয়াটার কি শুধুই খান?'

মা নিস্তব্ধ ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম না আর।

—'সোডার দামটা যেন তোমার বাবা দিয়ে দেন।'

—'বাকিতে আনাচ্ছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'মেসে গিয়ে প্রথম দিকটা বড্ড খারাপ লাগে, মা। গিয়ে পৌঁছেই একেবারে দুপুরবেলা, মানুষজন নেই, এমন খাঁ খাঁ করতে থাকে, খুকির জন্য বড্ড কষ্ট লাগে।'

মা.....

—'তোমার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়; অবাক হয়ে ভাবি, তোমাদের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে কি না?'

—মা.....

—'নিচে নেমে দেখি চৌবাচ্চা শূন্য; খানিকটা ঠাণ্ডা ভাত, পুঁয়ের চচ্চড়ি আর ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে, উপরে চলে এসে, পথের ধুলো-কালি-মাখা বিছানাটা পাতি। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু সাধ্য নেই—ছটফট করে উঠে বসতে হয়।'

মা.....

—'বিছানায় উঠে বসে ফুটপাতের ওপাশে মস্ত তেতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি—দেখি আকাশ প্রদীপ দেওয়া শিকের উপর একটা চিল বসে আছে, কতকগুলো পায়রা; ছাদে তারের ওপর চওড়া লাল পাড়ের, কস্তা কালো পাড়ের কতকগুলো শাড়ি শুকচ্ছে—এক ঝলক শান্ত নিরিবিলি ঘরকন্নার গন্ধ আসে; এমন লাগে!'

মা.....

—'চেয়ে দেখি এক জন বর্ষীয়সী মহিলা ভিজে চুলে সিন্দুর মাথায় লুচি ভাজবার ঝঁঝরি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কিংবা এক জন তরুণী স্নান খাওয়ার পর পান চিবুতে-চিবুতে....।'

মা.....

—'মেসের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি আর। চাকরটাকে দু পয়সা বকশিস দিই—বলি, রাস্তার কলে এক বালতি জল তুলে আনতে। তাই দিয়ে স্নান করে পথে বেরিয়ে পড়ি।'

—'কোথায় যাও?'

—'দুপুরবেলা কোথায় আর যাব? সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই সাত বছর ধরে গিয়ে দেখে এসেছি। ওয়াই-এম-সি-এ-তে গিয়ে কাগজ পড়ি খানিক। রেইনট্রি গাছের নিচে গোলদিঘির বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। আকাশ, মেঘ, দিঘির জল, চারপাশের ফুলের কেয়ারি ও দেবদারু ডালপালার দিকে তাকাই। মনে হয় পৃথিবীটা তো সুন্দর ছিল, মানবজীবনের সম্ভাবনাও ছিল চমৎকার। এত সহজে বসে উপলব্ধি উপভোগ করছি এ তো ঢের, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে মাছির মত মনে হবে; অন্ধকারের মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার যতখানি নিস্তার তার চেয়ে একটুও বেশি পথরেখা দেখবার উপায় থাকবে না।'

মা....

—'কয়েক মিনিট বসে থাকতে-থাকতে জীবনটা কেমন ছটফট করে ওঠে, আবার বেঞ্চির থেকে উঠে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াই। রাস্তা পেরুতে গিয়ে দেখি একটা বাস আর-একটু হলেই আমাকে গিলে ফেলছিল আর কি!'

—'কলকাতার পথে খুব সাবধানে চলতে হয়।'

—'হ্যাঁ সাবধানে বরাবরই চলি। তবে মাঝে-মাঝে মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।'

—'বাসের ধাক্কা খেলে তো আর রক্ষা নেই।'

—'অবিশ্যি সম্ভাবনটা খুব কম।'

—'ফুটপাত দিয়ে চলো।'

একটু চুপ থেকে—'তারপর চায়ের দোকানে গিয়ে বসি।'

—'দুপুরবেলাও চা পাওয়া যায়?'

—'হ্যাঁ, চব্বিশ ঘন্টা!'

—'কিন্তু দুপুরবেলা চা খেতে ইচ্ছে হয় তোমার?'

—'ওখানে থাকতে তো মাসের মধ্যে দু-চার দিন যাই।'

একটু হেসে—'তুমি আছ, বাবা আছেন, খুকি আছে, তার মা আছে—চারদিকে আমার কল্যাণের মত রয়েছ তোমরা, এ কথা ভাবতে গিয়েই মন তৃপ্তি হয়ে থাকে। মনকে প্রবোধ দেবার জন্য কোনো অনাবশ্যক কথা বা ঘুষের দরকার হয় না এখানে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা.....

—'কিন্তু কলকাতায় মনটাকে স্থির করবার জন্য এমনি সব ছোটখাটো ঘুষের দরকার হয়ে পড়ে।'

মা...

—'চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি।'

—'দুপুরবেলা আরো অনেকে চা খায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ক্রমাগত মানুষ এসে খেয়ে যাচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কটা অব্দি?'

—'সে প্রায় রাত বারটা।'

—'সেই এক পেয়ালায়ই হয় তো পর-পর পঁচিশ জন খেল?'

—'প্রায় সেইরকমই হয়; তবে পেয়ালা ধুয়ে নেয়।'

—'ধুয়ে নিলেও তো আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না; আর কেমন করেই-বা ধোয়—দায়সারা গোছের নিশ্চয়ই? তা ছাড়া আর কী? ছি, খেতে ঘেন্না করে না তোমার?'

—'এক কাপ চা সামনে রেখে ভাবি, কলকাতায় এসে এবার প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে যাব না, জীবন এবার পুরস্কার পাবেই; মনে ধীরে-ধীরে আরো উৎসাহের সঞ্চার হয়; খানিকটা বল পাই।'

মা....

—'মনে মনে নানারকম ছক কাটি, কী করব না-করব গতিবিধি ঠিক করি। চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ বসে থাকি।'

মা...

—'কিন্তু পথে নেমেই কী রকম শূন্যতা, কোনো উপায় দেখি না যেন। চারদিকে সাজানো—গোছানো দালান-দোকান, সাইন বোর্ড, প্রতিষ্ঠিত জীবনের পরিচয় দেয়। ট্রামে-বাসে মানুষের দল তাদের জীবনের সঙ্কল্প ও কষ্টের কথা প্রচার করে চলে—চড়-বড় অফিস-অদালত কলেজ-স্কুল ইনস্টিটিউশানগুলো জীবনের ব্যস্ত মোহাসক্ত মৌমাছির নির্বিবাদ নিরপরাধ গুঞ্জন; অপরূপ! গ্রামোফোনের দোকান থেকে গান ও টাকার ঝনঝনানি জড়িয়ে মিশিয়ে কানে এসে লাগে। বুঝতে পারি না জীবনের প্রয়োজনে কোনো আওয়াজটার রূপ ও সফলতা বেশি, এগিয়ে যাই—রেডিও তার কাজ করে চলেছে; কাগজওয়ালা সব কাগজ বিক্রি করে ফেলেছে, এখন নাগরাই পায় দিয়ে বাড়ি চলে গেলে পারে, কিংবা সাইকেল চলে আরো একগাদা কাগজ নিয়ে আসবে; পানওয়ালির ভিজে চুল সিথায় সিন্দুর, অফিসের বাবুদের পান জোগাতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে সে। বইয়ের দোকানে বিস্তর ভিড় হয় তো—কলেজে সেশান আরম্ভ হল। হু-হু করে নোট কাটছে। কাটা কাপড়ের দোকানে মৌতাত লেগে গেছে, হয় তা সেলের বিজ্ঞাপন। থিয়েটারে তিনটের সময় থেকেই ম্যাটিনি আরম্ভ হবে, একটা হ্যান্ডবিল হাতে এসে পড়ে, একটা নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের বড় পোস্টার নিয়ে গাধার টুপি ও সঙের পোষাক এঁটে সারি-সারি কতকগুলো লোক নিঃশব্দে হেঁটে যায়। বালিগঞ্জের দিক থেকে একটি প্রসন্ন প্রদীপ্ত পরিবার অসংখ্য সুটকেস-ট্রাঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে শিয়ালদার দিকে ছুটছে। হয় তো দার্জিলিঙে যাবে। খানিকটা বৃষ্টি হয়ে হয়ে গেল, একটা শেড খুঁজে বার করতে-করতে ঢের ভিজে গেলাম। ভিজে ফুটপাতে হাঁটতে-হাঁটতে এক জন রোগীর ছিটানো থু থু আর-একটু হলেই গায় লাগছিল, একটা দোকানের মস্ত বড় পা-পোষ আমার মুখের সামনে ঝেড়ে নিল। একটা মহিষের লেজের বাড়ি খেলাম। বেলিং-ঘেরা এক বারান্দায় এক অনিন্দ্য সুন্দর খুকি দাঁড়িয়ে আছে, সেই একটি আনিন্দ্য সুন্দর খুকির মুখ অনেকক্ষণ মনকে আকর্ষণ করে রাখে। নিরর্থক একটা বেটনের গুঁতো খেলাম। দেখি, বড় রাস্তার মোড়ে একটা উত্তেজিত ভিড়ের কাছে এসে পড়েছি। এগিয়ে চলি, কয়েকটা কাক দেবদারু গাছের ভিজে শাখার দিকে উড়ে গেল। খুপরির মতো স্টলে বসে লুঙ্গিওয়ালা মুসলমান ছোকরারা নিদারুণভাবে শাল পাতা কেটে চলেছে, বিড়ি তৈরি করবে।'

মা...

—'এক-এক দিন রেসের মাঠে যেতে ইচ্ছা করে।'

মা...

—'কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না আর; মাঠটা কোথায় তাও ঠিক জানি না।'

মা...

—'তিন টাকার টোটে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে এক-এক দিন খবরের কাগজ খুলে দেখতে পাই, অবাক হয়ে ভাবি দুই-তিন মাসের টিউশানের টাকা পাঁচ মিনিটেই পেয়ে গেল? উৎসাহ ও উত্তেজনার কলরবের ভিতর? প্রলুব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি খানিকক্ষণ—কিন্তু স্থির হয়ে নিজের স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়—তা না হলে বাঁচতেও পারব না যে!'

মা...

মা অবশ্য রেসকোর্স, রেস বা টোটের কোনো মানেও জানেন না।

—'লটারির টিকিট কলকাতায় গিয়ে ইদানিং কিনছি—এক টাকায় চার খানা পাওয়া যায়, আট আনার কিনি।'

—'টিকিট কিনলে কী পাওয়া যায়?'

—'কপালে যদি থাকে আট—দশহাজার টাকাও জুটতে পারে।'

—'আট আনার টিকিটে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একখানা চার আনার টিকিটেও।'

—'তাই না কি? তাহলে তো সে বড় সৌভাগ্যের কথা।'

—'কিন্তু কয়েকবার কিনে-কিনে দেখেছি—শুধু টিকিটের পয়সাটাই যায়; এখন বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, কিনব না আর।'

—'আরো দু-তিন বার কিনলে পার।'

—'মাঝে-মাঝে মনে হয় দু-এক মাড়োয়ারির পকেট কেটে নিলে পারি।'

—'এমন কথাও মনে হয় তোমার?'

—'হ্যাঁ, অত্যন্ত অবসাদ নিরাশার মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় বই-কি; কোনো বড় লোকের বাড়ি, ব্যাঙ্ক বা মাড়োয়ারির টাকার ওপর লোভ জন্মায়; তাদের তো অনেক আছে, অত অতিশয্যের দরকার কী? হৃদয় মনের স্থূলতা ও পাশবিকতায় অর্থ জমিয়ে অর্থ খরচ করেই-বা কী লাভ তাদের? আমাকে কিছু দিক—মানুষের ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য বিধাতার হৃদয়-হীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাক—দেশে ফিরে যাই, দু'মুঠো খেয়ে বাঁচি, কবিতা লিখি, শার্ট তৈরি করি।'

হাসতে লাগলাম।

—'কিন্তু এ-ভাবে শিগগিরই কেটে যায় আমার। দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভিতর অজস্র নিপীড়িত আত্মা ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখি। চেয়ে দেখি কুষ্ঠ রোগী জীর্ণশীর্ণ কাঠের ঠেলা গাড়িতে বসে আছে তার। ভিজে ফুটপাতের উপর এক পাশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু গাছের ছায়ায় নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে-ঘাটে রাস্তায় পৃথিবীর আদি অসীম স্থিররূপ আবিষ্কার করি আমি। নিজের জীবনের বেদনাকে মুকুটের মত মনে হয়। বাদলের বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রাম-বাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখপাখালির কলরবে এক-একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায় আমার।'

মা.....

'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'

—'কার? তোমার? কেন?'

—'চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

—'ও, এই রকম? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায়?'

—'গঙ্গার একটা ঘাট।'

—'কোন দিকে বলো তো?'

—'তুমি দেখো নি।'

—'ঢের জাহাজ দেখা যায় বুঝি সেখান থেকে?'

—'তা যায়।'

—'রেঙ্গুনে যে-জাহাজগুলো যায় তা দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'আমি একবার দেখেছিলাম—সে! অতবড় জাহাজ মানুষ বানায় কী করে?'

—'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা?'

—'কেন? সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন?'

—'কিংবা, খুন করে জেলে গেলে?

—'স্ত্রী-সন্তান আছে, মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ?'

—'জেলের বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি?'

—'বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে—'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তা হলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'

—'কী সে বিশ্বাস?'

—'যে-বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

—'তোমার রকম-সকম দেখে মনে হয় সংসারেও কোনো বিশ্বাস নেই তোমার।'

—'তা বরং খানিকটা আছে।'

—'কই? কোনো নজির তো পাই না।'

—'দেখো না, বিয়ে করেছি, আজকালকার দিনে কোনো বিষয়াসক্ত লোকও বিয়ে করতে চায় না, কিন্তু আমার সংসারাসক্তি তাদের চেয়েও যে কত গভীর, কল্যাণীকে এখানে এনে যে ক্ষয় করছি তাই কি তার প্রমাণ নয়?'

—'এত তো বোঝ তবু অকর্মন্য থাক কেন?'

—'তার পর দেখ, একটি সন্তানেরও জন্ম দিয়েছি। পৃথিবীতে এসে সংসারকে পুজো করবার লোলুপতাই তো অত্যন্ত বীভৎসভাবে দেখালাম।'

—'এখন থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা কর।'

—'চেষ্টা করছি। অন্তত সন্তান সৃষ্টি করব না আর।'

—'বেশ, তা না—করাই ভাল। কোনো কালেও যেন না-হয় আর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সাজতে চেয়েছিলাম জীবনের সেবায়েৎ, সেজে বসেছি সেবাদাসী। উপভোগ নেই, অন্ধতা ও বেদনার ভোগ্য হয়ে বেড়াচ্ছি।'

—'যাও, কলকাতায় গিয়ে একটা টিউশান জোগাড় করে নাও। এ দুর্যোগ আস্তে-আস্তে ঘুচিয়ে ফেলো।'

—'বাবা বলছিলেন তেলা কিংবা উল্টোডিঙ্গিতে টিউশান পেলে না-নেওয়াই ভাল।'

মা ভ্রূকুটি করে—'কেন? নেবে না কেন?'

—'এই-বৃষ্টি বাদলা, অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে হয়। মেস থেকে প্রায় দু-তিন মাইল দূরে।'

—'সেই জন্য তোমার বাবার কষ্ট বুঝি? তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে তুমি একাই এ-রকম কষ্ট কর? পৃথিবীতে বাপ মায়ের সন্তান তুমি কি শুধু একা? কত কৃতী, মেথরের কাজ করছে, তাদের বাপ নেই? কত ছেলে দেশ-ভুঁই তিন দিনের পথের পিছনে ফেলে, গঞ্জে-গঞ্জে কয়লার কাজ করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা বাপ-মায়ের সন্তান না?'

—'বাবাকে বলো না মা, কিন্তু তোমাকে বলছি, চেতলায় হোক, বা ঢাকুরিয়ার হোক, দশ-দশ টাকার টিউশান পেলেও আমি নেব।'

একটু চুপ থেকে মা—'মেসের থেকে চেতলা কত দূরে?'

—'এই মাইল চারেক।'

—'আর ঢাকুরিয়া?'

—'সেও ঐ রকম।'

—'হেঁটে যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন? ট্রামে গেলে হয় না?'

—'ধরো, যদি দশ টাকা দিতে চায় তা হলে ট্রামে গেলে আর কী থাকে?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'সকালবেলা যেও।'

মাথা নেড়ে—'তাই যাব। কিন্তু ভয়, পৌঁছতে-পৌঁছতে ছেলের স্কুলের বেলা হয়ে যায় যদি।'

—'তাই ত; তা হলে সন্ধ্যার পর যাবে।'

—'তাই তারা যেতে বলবে।'

—'কলকাতার ভিতরে টিউশান পাও না?'

—'পেলে নেব।'

মা আমার মাথার দিকে হাত বাড়িয়ে—'আমি আশীর্বাদ করি, তাই যেন পাও।'

একটু চিন্তিতভাবে—'কিন্তু বাইরে যদি পাও?'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'তা হলে একটা ছাতা কিনে নিও।'

ঘাড় নেড়ে বললাম—'আচ্ছা।'

জননীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বললাম—'বাতাসা আছে মা?'

—'কেন?'

—'একটু চিবুতাম।'

—'রাতে ভাতের সঙ্গে খেও।'

একটু চুপ থেকে—'মেজকাকার জন্য আজ লুচি ভাজবে না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাকে একখানা দেবে?'

—'শুনে দশখানা ভাজি শুধু।'

—'আজ না-হয় এগারখানা ভাজলে।'

—'কই? তোমার বাবা তো এ-রকম বলেন না?'

—'লুচির জন্য বেগুন ভাজ বুঝি?'

—'হ্যাঁ বেগুন ভাজি, ডিম ভাজি।'

মায়ের হৃদয়—একখানা লুচি নিয়ে আসবেন নিশ্চয়ই আমার জন্য। বিকেলবেলা ভাবছিলাম, লুচিটা পেলে খুকিকে ছিঁড়ে দেবে খানিকটা। বাকিটা দেব কল্যাণীকে। তারা আমাকে রাজা মনে করবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সন্ধ্যা উতরে রাত হয়ে গেল—তবুও কেউ এল না। জল ধরে গেছে। সন্ধ্যার সময় বিরাজ এসে হাজির হল। ছোঁড়া জুতো পায়, মাথায় অজস্র বেয়াদপ চুল আইনস্টাইনের মত, মাইনাস দশ-নং এর চশমা, উৎক্ষিপ্ত দাঁড়কাকের ডানার মত বিরাট গোঁফ, ছেঁড়া ঢলঢলে নোংরা জামা। যেখানে-সেখানে কালির চ্যাপসা। বুকে নকল সোনার বোতাম। জমকালো জীবনের কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে—এখন জোর করে বেচারিকে আটকে রাখা শুধু।

মস্ত বড় সাদা ন্যাকড়ার তালিওয়ালা ছাতাটা কয়েকবার ঝেড়ে লম্বা-চওড়া দোহারা শরীর নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—'এসো বিরাজ।'

বাজখাই গলায় চিৎকার করে—'যা চেপে জল এল। তোমার এখানেই আস্তানা নিলাম। কী করছ, সন্ধ্যার সময় বসে-বসে? বেরোও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, জলের ভিতর আজ আর বেরুলাম না। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই—কত দিন হবে হে? প্রায় বছর তিনেক?'

—'সে-সব মনে আছে কার? হ্যাঁ, বসে-বসে হিসেব-কিতেব করি, আর-কী? তোমাদের বাড়িটা পথের ধারে পড়ল—ঝড়—জল—খেয়াল হল—এলাম চলে।'

—'বেসো।'

একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

—'চেয়ার তোমার যা! দেখছি তো, লোহার, কাঠের না কাঁঠালের? ঠাকুদ্দাদা কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি? বসলে ভাঙবে না তো?'

—'ভাঙলে না—হয় আর-একখানা চেয়ার দেব।'

—'চেয়ারের দাক্ষিণ্য খুব আছে দেখি, চশমা খুলে হো হো করে হাসতে লাগল।

—'আজকাল প্র্যাকটিশ করছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখানকার বারেই? চলছে কেমন?'

—'লগি গুতিয়ে চলেছি।'

—'শুনলাম ওকালতিতে সুবিধা হচ্ছে না কারো আজকাল?'

—'কেন হবে না? যারা ইডিয়েট তাদের হয় না।'

—'তুমি তা হলে পাচ্ছ বেশ?'

একটা হুমকি দিয়ে বললে—'ব্যবসা কি চাকরি নাকি, যে বাঁধাধরা থাকবে? আজ না-হয় মাসে পনের টাকাও না পেলাম—কিন্তু তাই বলে কাল পনের শ টাকা পেতে বাধা কোথায়?'

—'তা নেই অবিশ্যি।'

—'এই তো সাব-ডিভিশনে প্র্যাকটিশ করছি। এরপর সদরে যাব।'

—'কেস নিয়ে?'

—'কেস নিয়ে কেন? সেখানে গিয়ে বসব, হিয়ার করব, সরকারি উকিলকে ইঁদুরের গর্তে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব!'

হা হা করে হেসে উঠল আবার।

বিরাজ অবিশ্যি মেধাবী ছাত্র ছিল, কিন্তু এখন তার পাতলুন, বোতাম ও জামার দিকে তাকিয়ে বোধ হয়, মেধার পুরস্কার সে বিশেষ কিছু পাচ্ছে না।

—'শিগগিরই বসছ গিয়ে তা হলে, সদরে?'

—'কালও যেতে পারি, তিন বছর পরেও।'

চুপ করে ছিলাম।

—'সদর থেকে যাব হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে যাবে?'

—'নিশ্চয়ই! বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে—এই সব ডিস্ট্রিক্ট জজদের ঘাড়ে চেপে-চেপে বেড়াব।

—'কী করে?'

—'পনের বছরের মধ্যে উইগ মাথায় দিয়ে গিয়ে বসব; ইয়া টাই ঝুলিয়ে, কাল গাউন পরে—হাই কোর্টে।'

—'হাই কোর্টে ব্যাক করাবার কেউ আছে তোমার?'

—'ব্যাক? স্যার রাসবিহারীর কে ছিল? ঘাড়ের ওপর একটা হেডপিস পেয়েছি কিসের জন্য!'

খুকি বিছানায় ঘুমিয়েছিল, বিরাজের বক্তৃতার গরমে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল।

বিরাজ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে—'এটি বুঝি তোমার মেয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

আমি—'বসো বিরাজ। ওকে ওর ঠাকুমার কাছে দিয়ে আসি।

রান্নাঘরে খুকিকে রেখে দিয়ে এসে দেখি, বিরাজ চশমাজোড়া কপালে আটকে বাংলা খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছে।'

আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলে বললে—'এই সব সাপ-ব্যাঙ পড়ো না কি তুমি?'

—'কাগজটা আজ রেখেছিলাম। কেন? কী লিখেছে!'

বিরাজ কাগজটা একেবারে চোখের কাছে তুলে নিয়ে বললে—'লিখেছে রালোয়া তহশিল.....'

—'সে কোথায়?'

—'তারিখ দিয়েছে, গোয়ালিয়র থেকে।'

—'ও।'

—'রালোয়া তহশিলের মুসনে গ্রামের এক পাল গরু পাঁচদেওলি পাহাড়ের গোচারণ ভূমিতে চরিতেছিল।'

—'বেশ কথা।'

—'চরিতে-চরিতে গাভীর পাল এক বিস্তৃত বনজঙ্গলের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌছায়।'

—'আচ্ছা।'

—'প্রকাশ,যে সেই সময়ে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে একটি গরুর উপর লাফাইয়া পড়ে।'

—'বটে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'অন্যান্য গরুগুলি পলাইয়া না যাইয়া একযোগে ব্যাঘ্রটিকে আক্রমণ করে।'

—'বাঃ।'

—'গাভীগণের তীক্ষ্ণধার শিঙের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটি জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া যায়।'

—'হুঁ?'

—'বহু গ্রামবাসী দূর হইতে এই গাভীদলের সমবেত আক্রমণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।'

—'বাঃ বাঃ।'

—'এই সব আস্তাকুঁড় পড়ে দিন কাটাচ্ছ বুঝি?'

বিরাজ মর্মান্তিক বিক্ষোভে কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'এই কাগজের ব্যবসা, এর চেয়ে পান-বিড়ির ব্যবসাও ভাল—খদ্দের জমাবার জন্য নাকে এমন রসকলি কাটে যারা।' একটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—'তোমার এখানে কী বই আছে?'

—'কী রকম বই চাও?'

—'...বই আছে?'

—'না।'

—'রাইমসের কোনো বই আছে? জে-এম-এর? বাঃ, নাম শোনো নি?'

—'শুনেছি। নেহাত চাষাভূষো ছাড়া কে না শুনেছে? তার কোনো বই কি আর এখানে পাবে? না, আমার কাছে সে সব কী আর থাকবে?'

অপ্রতিহত হয়ে বিরাজ—'মানির কোনো বই নেই?'

মাথা নেড়ে—'আমার এখানে? দূর। ইকনমিকস নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত কেন? তোমার কাব্যচর্চা তো ব্রিফ নিয়ে।'

বিরাজ গলা খাঁকরে, ধমক দিয়ে,—'বইখানার নাম শুনেছ!'

—'এই তো এইমাত্র শুনলাম।'

—'এর আগে শোনো নি?'

—'না।'

—'ইডিয়ট! এ সব কী বই তাকে সাজিয়ে রেখেছ তা হলে?'

—'দেখ-না।'

চশমাটা কপালে আটকে নিয়ে বিরাজ একখানা বই তুলে—'পোয়েট্রি।'

আর-একখানা বই তুলে পড়ল-'টেলস্ অফ মিসট্রি!'

আমার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে ফিরে তাকিয়ে—এটা কে? এরা শালা-ভায়রা একটা কিছু বুঝি? না মাসতুত ভাই?'

রাগে-বিরক্তিতে গজগজ করতে-করতে বিরাজ বই দুটোকে ঠেলে দিয়ে আর-একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ে বললে—'অলিভার টুইস্ট? চার্লস ডিকেন্স?' পরের বইখানা তুলে পড়তে-পড়তে—'ডেভিড কপারফিল্ড। চার্লস ডিকেন্স। এগুলো কী?'

—'নভেল।'

আমার দিকে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে—'এই রত্নটি কে?'

গম্ভীরভাবে—'কার কথা বলছ?'

—'এই-যে, যার ভোগের থালা দিয়ে তাকখানা সাজিয়ে রেখেছ।'

—'ডিকেন্স?'

—'হ্যাঁ, মাই হার্টস সিক্‌নেস।'

—'ডিকেন্সের নাম শোন নি বিরাজ?'

—'মানে তো শয়তান।'

দু-তিন ধাপ পরে গিয়ে বিরাজ আর-একখানা বই হাতে তুলে নিয়ে-'এখানা কী?'

ধীরে-ধীরে পড়ল—আনন্দ মঠ। আরো পড়ল—'বঙ্কিমচন্দ্র।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'হদ্দ করল বাড়ির মধ্যে প্যাদা এসে।'

বইখানা অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে পড়ে গেল বিরাজের; বইয়ের উপর দিয়ে পাতলুন চালিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ সে তাকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করে।

—'...এর কোনো খবর রাখো?'

—'অনেকক্ষণ তো বসলে বিরাজ। চা খাবে?'

—'....এর আর...এর মধ্যে বড্ড কষাকষি, চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব এবার বুঝি যায় টেঁশে।'

—'চা এনে দেই?'

বলতে-বলতে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে জমকালো গোঁফজোড়া একবার শানিয়ে নিয়ে সাদা তালিমারা ছাতাটা মাথায় দিয়ে বিরাজ শ্রাবণের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। বিরাজের মত এমন অমূল্য জিনিস সাবডিভিশানের কোর্টে নষ্ট হয়ে যায়।

যদুনাথবাবু টাকাপয়সাওয়ালা লোক, বাপের বিপুল জমিদারি ছিল; অনেক খুইয়েছে। তবুও দেদার পড়ে রয়েছে, সারা জীবন এঁর টিকিও এদিকে কেউ দেখে নি; কাশীর থেকে সিমলা, সিমলা থেকে কাশী এই ছিল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিতি, এদিকে বড় একটা আসেন নি। বুড়ো বয়সে অবিশ্যি এখন দেশে এসে বসেছেন। সকালবেলা কোনো একটা ইলেকশন সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে ভোটের জন্য যদুনাথবাবু এসে হাজির হলেন। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর আমার ঘরে ঢুকে বললেন—'কী করছ? কিছু না? বাড়িতে চুপচাপ বসে আছ বুঝি?'

একটা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়—সিল্কের উড়ানি, এক মাথা সাদা চুল, তার উপর চিরুনির কোনো ব্যবহার নেই। খুব সাধারণ এলবার্ট জুতো পায়। ভাল করে বুরুশও করা নেই। মুখে আন্তরিকতার চেয়ে আগ্রহ বেশি; চোখ চতুর ও চিন্তাশীল; জীবন পণ্ড হল, না কৃতকার্য হল, সে বিষয়ে সমস্যা এখনো যেন শেষ হয় নি, মুখাবয়বের উপর এ-রকম এক ভাব; হৃদয়ে পরিকল্পনা ও উৎসাহের অভাব নেই।

চেয়ারটা টেনে বসে, আক্ষেপ করে মাথা নেড়ে—'তোমাদের দেখে বড় দুঃখ হয় আমার; এই তো বি-এ পাস করেছ, বি-এ না এম-এ? এম-এ? বেশ-বেশ, তা হলে তো গাজন আরো চমৎকার—কুড়িয়ে -বাড়িয়ে বয়সও, তোমার বাবা বললেন, চৌত্রিশ। বিয়ে করেছ, সন্তান রয়েছে অথচ একটা মুটের যা সম্বল তাও তোমার নেই।'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে—'দিনান্তে দুটো পয়সা নিজের বলে খরচ করতে পার? কী আক্ষেপের কথা! চাকরি খুঁজছ?'

—'এবার যাব কলকাতায়।'

—'কবে?'

—'এই সপ্তাহখানেকের মধ্যে।'

—'কী, চাকরি পাবে?'

—'দেখি।'

হাত নেড়ে—'মিছে কেন কলকাতায় ফোপর দালালি করতে যাও? তুমি মনে করেছ আমিই একা এম-এ পাস করে বসে আছি—এমন আশি হাজার ছেলে তোমার মত বাংলাদেশের পথে-ঘাটে ঘুরছে—একটা ছাগল সারাদিন চরে যে ঘাসটুকু পায় তাও জোটে না।'

চুপ করে ছিলাম।

খানিক ধোঁয়া ছেড়ে—'মিছিমিছি নিজেকে ঠকিও না; সে যাদের শ্বশুর—সম্বন্ধী থাকে তাদের চাকরি জোটে—এ কাঠামে তোমার কিছু হবে না—একটা টেকনিক্যাল কিছু শেখো।'

কোনো জবাব দিলাম না।

—'শিখে এসো।'

—'টাকা নেই।'

—'বেশ, তা হলে ব্যাঙ্কিং শেখো-না। তাও টাকা নেই? আচ্ছা, তা হলে নিরিবিলি বসে দর্জিগিরি শেখো না কেন?'

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'কিংবা ডিমের ব্যবসা করতে পারে, ছোট ডিমের?'

—'পোলট্রি ফার্মিং।'

—'আঃ, সে তো ঢের বড় কথা হল; এক নিশ্বাসে মগডালে বড়ে বসতে বলি না। আমার অবিশ্যি একটা কথা অনেক সময়ই মনে হয়েছে এই যে যদি কোনো ভদ্রলোকের ছেলে দেশগাঁয়ে এসে দুধের ব্যবসাটা ধরে, তা হলে টাটকা দুধও খেতে পারি, চাকরি সমস্যাও খানিকটা মিটে যায়, কী বলো?'

—'দেখলে হয়।'

ভ্রূকুটি করে হেসে—'আরে দূর! আজকালকার শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে ভদ্রলোকের ছেলেরা যত চশমখোর চামার হয়েছে, ছোট লোকরা কি আর তত রে ভাই? না হয় জোলো দুধ দিচ্ছে কিন্তু তোমরা ব্যবসা শুরু করলে পিটুলি গোলা খেতে হবে।'

চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে—'তা ছাড়া গরুর যত্ন আমরা জানি কোনো লোক? ধবলী, কমলা, মঙ্গলী বলে যতই আদর করি, বিলেতের একটা কসাইও আমাদের চেয়ে—দেখবে মিল্ক কোম্পানির বিজ্ঞাপনের পাশে গরুর ছবিগুলো? কিংবা যে-কোনো বিলিতি কনডেনসড মিল্ক কোম্পানির ইতিহাস পড়ে দেখলেই পার, আমাদের মত তেঁতুলের খোশা আর হাঁসের ডিমের খোলা দেয় না তো। কী সব প্রাইজ পেয়েছে, শুনেছ?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'খবর কিছু রাখ না দেখছি। কেবল উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য? আরে ধেত্তরি তার শিবনৃত্য! শিবচক্ষু।'

আমার দিকে তাকিয়ে—'ডারবাইতে যে রয়েল শো হয়। ডারবাই বলতেই ভেবেছ হয় তো রেসের কথা!'

—'না, তা নয়—'

—'রয়েল শো রেসের চেয়ে ঢের বড় জিনিস। সেখানে এবার গাভীগুলো ছটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ, আরো সাঁইত্রিশটা।'

চক্ষুস্থির করে আমার দিকে তাকালেন।

বললেন—'এখন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ সের দুধ রোজ দোয়া হচ্ছে। আর সে দুধ কী? খেতে লাগে স্রেফ হুইস্কির মত।'

চুরুটটা নিভে এসেছিল; হাতে রেখে যদুনাথবাবু—'মোটর ভেকেলস্ ডিপার্টমেন্টে কত মোটর পারমিট হয়েছে হিসেব রাখ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না।'

বাঁ-হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে—'পাঁচ হাজার প্রাইভেট কার, দু'হাজার ট্যাক্সি, এক হাজার বাস।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এই সব ছুটছে; কত ড্রাইভার দরকার হয়, ভেবে দেখ তো! মোটর ড্রাইভারি শিখে নাও।'

ভাবছিলাম।

—'যা পাবে, তাতে দশটা মাস্টারমশাইকে গিলে ফেলতে পারবে। এটা হীন কাজ বলে ভাবছ? স্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে মাস্টারমশায়রা যা সম্মান পান—তার চেয়ে ঢের বেশি সম্মান পাবে।'

ধীরে-ধীরে চুরুট টানতে লাগলেন।

চুরুটে একটা টান দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—'না-হয় জমি চাষ করো। লাঙল ধরো, হলধরের মত, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিকে জলে ফেলে দাও।'

—'জমি ঢের কিনতে হয়।'

—'কালেকটরের সঙ্গে গিয়ে দরবার করো। দু শ বিঘে চর লিখে দেবেন চাষবাস করার জন্য।'

—'একবার গিয়েছিলাম।'

—'তার পর?'

—'শুনলাম ডিসট্রিবিউশন হয়ে গেছে।'

—'কুছপরোয়া নেই, তোমাদের এই ঘরদোরের চারিদিকে আধ বিঘে জমি হবে তো? মা সর্বমঙ্গলার নাম নিয়ে শুরু করে দাও।'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দাঁড়াও, তোমাকে বাতলে দিচ্ছি আমি।'

চুরুটটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে আর-একটা চুরুট বার করে—'পঞ্চাশ বছরই তো এসব করলাম বসে-বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তোমাকে লাভ নেই বাছা। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে—অন্তত পঞ্চাশ একর আবাদি জমি যদি না জোগাড় করতে পার, চাষবাসের কাজে হাত দিয়ে কোনো ফয়শালা নেই।'

বললেন—'তা যদি জোগাড় করতে পার, তা হলে পেটে ভাত খেয়ে থাকতে পারবে।' পকেট থেকে দেশলাই বার করে—'কিন্তু জমি পেলেই তো হল না শুধু, আরো দু'হাজার মূলধন লাগবে।'

দেশলাই-এর গায়ে একটা কাঠি ঘষতে-ঘষতে—'পরে যদি একশ একর জমি আর চার হাজার টাকা ক্যাপিট্যাল জোগাড় করতে পার তা হলে মাথার ঘাম পায় ফেলে উপার্জন করলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ তোয়াজেই থাকতে পারবে।' কাঠিটা জ্বালতে না-জ্বালতেই নিভে হাতের থেকে পড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে—'কিন্তু দশ-বিশ একর জমিতে কিছু কাজ হবে না। তা তোমাকে অনেক আগেই বলে রাখছি। দশ একর জমি নিয়ে এক জন আনাড়ি হয় তো বড় জোর পনের-বিশ টাকা সংস্থান করতে পারবে। এক জন ঘুঘু পারবে হদ্দ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তাও ধরো যদি বন্যা হয় বা অনাবৃষ্টি-অজন্মা, তা হলে তো সবই গেল। ভগবান আমাদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসেন। এত বড় সৃষ্টি ফাঁদিয়ে বসে কী করবেনই-বা আর। কাজেই কখনো আকাশ থাকে শুকিয়ে, কখনো পৃথিবী যায় ডুবে।' আর-একটা কাঠি জ্বালাতে চেষ্টা করলেন যদুনাথবাবু। সেটাও নিভে গেল।—'কাজেই টাকার জোর থাকা চাই। অন্তত লাখ, দেড় লাখ টাকা মজুদ না থাকলে জমি নিয়ে খেলা করা বিড়ম্বনা; তার চেয়ে পরস্ত্রী নিয়ে ইয়ার্কি করাও ঢের নিরাপদ। এই কথাটা তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।....এক দল ছেলে খেঁকিয়ে উঠেছে ভাদ্র মাসের কুত্তার মতো—জমি চাষ করে তারা বড় লোক হবে। পারবে?'

এইবার ভাল করে কাঠি জ্বালিয়ে চুরুট জ্বালিয়ে নিলেন যদুনাথবাবু।

বললেন, 'রোজ এগার ঘণ্টা কাজ করতে পারবে? যদি বলি লাঙল ধরে ষোল ঘণ্টা, তা হলে তো, আচ্ছা, লাঙল না ধরে ষোল ঘণ্টা। যে-সব কিষান খাটাচ্ছ তাদের কাজকর্ম তদারকি করতে হবে। তাদের কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিতে হবে—অন্তত দশ-পনের বছরের মধ্যে নভেল বা নারীর মুখ দেখতে পারবে না, থিয়েটারে যেতে পারবে না, বায়স্কোপ দেখাবার জো নেই। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, প্রণয়িনী উচ্ছন্ন গেলেও ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না। সৃষ্টির বিধাতা যেমন হৃদয়হীন ও অনন্যকর্ম, অক্লান্ত ও ধূর্ত, তেমনি করে তোমাকেও জমি পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে।'

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম দু'জনে।

—'দেখ, যদি পার। অনেক ছোকরাকে দেখেছি বোশেখ-জ্যৈষ্ঠের ঝাঁ ঝাঁ আগুনের মধ্যে দশ-বার ঘণ্টা—একটা শয়তানেও পারে না। কিন্তু সেই ধকলটাই জমির পিছনে খাটাতে বললে তাদের চোখের তারা কপালে ওঠে। এমনই—'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'দিন-কাল ছিল তখন আমার, চোত-বোশেখের রোদে দশ ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা করে খেটেছি আমি। থার্মোমিটারে তখন এক শ সত্তর ডিগ্রি।'

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে-চালাতে যদুনাথ—'সূর্য না-উঠতেই বেরিয়ে যেতাম, ফিরতাম যখন আকাশে বাদুড় চরে।'

—'কোথায়?'

—'বললাম যে।'

—'সেখানে গিয়ে কী লাভ আপনার?'

—'লাভ ছিল, অমানুষিক ব্যবসায়ীই ছিলাম না শুধু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ থেকে—'জীবনের মনুষ্যত্বের দিকটাও একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করি নি আমি।'

চুরুটে টান দিয়ে—'থাক। এই তো সত্তর করলাম, এখন নিদেন বার ঘণ্টা খাটতে পারি'—একটু হেসে—'অবশ্য, বোশেখের রোদ এখন আর সহ্য হয় না।'

আরো খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—'কুমায়ুন পাহাড়ে চলো; যাদের এদিকে রুজি আছে ভারী আনন্দ পাবে তারা।'

নিভে গিয়েছিল চুরুটটা—জ্বালিয়ে নিয়ে, 'কিন্তু এতে ক্যাপিটাল লাগে আরো ঢের বেশি।'

—'কুমায়ুনে কী ফল হয়?'

—'আপেল হয়। পেয়ারা হয়, অবশ্য বিশেষ সুবিধার না, সবচেয়ে কাছে, তাও পাহাড় থেকে প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে, পথ-ঘাট খারাপ। বর্ষাকালে হাপুস চোখে কান্না আসে কিন্তু তবুও ফলের বাগান যখন তৈরি হয়ে ওঠে—বাংলার ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যা-সুখ, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি।'

—'এ দেশের ধানক্ষেতের শোভাও কি কম?'

—'ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে, ছেলেবেলার থেকেই দেখেছি কি না।'

—'কিন্তু সেই সময় থেকে—তারও ঢের আগের থেকে এই ধান ক্ষেত-গুলোর রহস্য ও বিচিত্রতা কী যে গভীর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তো জন্ম-জন্ম এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি।'

—'তাই থেকো, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না।'

যদুনাথ বলে চললেন—'পোস্ট-অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যদি কুমায়ুন থেকে মোরব্বা করার ফল—যেমন কুলুর থেকে ভি-পি-পি সিস্‌টেমে করা হয়—তা হলে অবিশ্যি সুবিধা আছে ঢের।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এ-সব কাজ বেদখল করে নেবে; বাঙালি তো দূরের কথা, পশ্চিমারাই কিছু করে উঠতে পারে কি না সন্দেহ।'

চুরুটের ছাই খানিকটা ঝেড়ে ফেলে যদুনাথবাবু—'এখানে যেমন চর দিচ্ছিল, কুমায়ুন পাহাড়ে তেমন যদি জমি দেয়, তা হলেও জমি তৈরি করে একটা বাগান খাড়া করতে, খেদ্দায় হাতি ধরার চেয়েও ঢের বেশি টাকা ও হেপাজত।'

খানিকটা নীল ধোঁয়া উড়ছিল।

—'ছোট-খাটো একটা বাগান যদি তৈরি করে নেওয়া যায়, কুড়ি একর মত বেশ তোয়াজ করা যায় যদি, গাছে যদি উপযুক্ত মত ফল ধরে, তা হলে একর বাবদ মাসে দুশ টাকা আসতে থাকে।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'আবার যাব ভাবছি, টাকার জন্য নয়-তা হলে পাটের ব্যবসায়। [টাকা ঢালতাম]; কুমায়ুনে আমার সেই কাল বিধবার মত বাগানটার গন্ধে-গন্ধে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দাঁত মুখ খিঁচে, ভেংচি দিয়ে—'আরো তা হলে তো কত জিনিসই করতে হয়। বিধাতা তো পনেরটা জীবন দেন নি, দিয়েছেন একটা, অথচ দুশটা জীবনের কামনা ও চরিতার্থতা এরই ভিতর গুদামজাত করতে হবে-মানুষের কি আর হাঁফ ফেলার সময় আছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাই আর ধুলো ঃ পথে—পথে ব্যর্থতা মাড়িয়ে চলা।'

চুরুটটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে—'এই তো আবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের জন্য ভোট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি—মাঝে-মাঝে দপ করে মনে হয়, কুমায়ুনে গেলে হত না? আমার সেই বাগানটা...সেই...

মাথা নেড়ে—'ভগবান নির্বাণ দেন নি, দিয়েছেন স্মৃতি; ভালবাসা দিয়েছেন। সমুদ্রের মত আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু দেহটাকে তৈরি করেছেন দুই রত্তি ঘুণ দিয়ে, এই যাঃ চুরুটটা নিভে গেল।'

জ্বালিয়ে নিয়ে—'তা কুমায়ুনে আমি তোমাদের যেতে বলি না, মোটা খাও না, জমিদারিও ভোগ করো না, সহাসনী নদীও নেই, সে ঢের টাকার শ্রাদ্ধ ভাই—সেই বাগানে গিয়ে ফলের বাগান তৈরি করা অন্তত ত্রিশ একর আন্দাজ জমি কিনেত হয়, বাড়ি তৈরি করতে হয়, ক্ষেত তৈরি করতে হয়, কমপক্ষে হাজার দুই অন্তত ফলের চারা লাগিয়ে দিতে হয়।'

চুরুটে এক টান দিয়ে—'তার পর সেই পরান কথার রাজকন্যাকে পোষো, ফল ধরতে—ধরতে আট-দশটা বছর কেটে যাবে। মনে হবে যেন জেলে রয়েছ'-চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—'কিন্তু মনের অবস্থাতে নিজেকে না মুখ করে বাঁচো যদি, তা হলে দুনিয়ার দালাল মুখ তুলে চাইবেন বই কি। ফকিরের কান্নায় তিনি হার্ট ফেল করেন না। ভিটের ঘুঘুর কষ্টে প্রাণ টন-টন করে ওঠে তাঁর। ফকির সাজা না ঘুঘু সাজা, পৃথিবীকে যদি উপভোগ করতে চাও তা হলে সৃষ্টির স্রোতের ভিতরকার অক্লান্ত সুবিধাবাদ ও অশ্রাব্য আত্মপরতাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে শেখো, ভগবানও আশীর্বাদ করবেন, নারীও হাতের পুতুল হবে।'

[দূর থেকে দূরে সরে যায়—

অন্তর্গত পৃথিবীর সুনিশ্চয় ঘন পরিচয়; প্রত্যাবর্তনের পথ নিঃশেষে মুছে—

কীর্তি সফলতা আর উদ্যমের বিপুলতা দিয়ে।

নির্বাসনের এক নিরন্ধ্র বলয় কাছে আসে।

কারুবাসনের লয়, নিরন্ধ্র বলয়—]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~